৩। **মাসআলা ঃ** এক জায়গায় কয়েকজন লোক বসা ছিল। আর একজনে তার একটা মাল সকলের জিম্মায় করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া চলিয়া গেল, এখন ঐ মালের হেফাযত সকলের জিম্মায় ওয়াজিব হইয়া পড়িয়াছে। যদি সকলে উঠিয়া চলিয়া যায়, আর ঐ মালটা খোয়া যায়, তবে সকলেই দায়ী এবং পাপী হইবে। আর যদি সকলে এক সঙ্গে না যাইয়া থাকে ; এক একজন করিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইয়া থাকে, তবে সকলের শেষ যে ছিল তার দায়িত্বে ঐ মালটা আসিয়াছে ; তার জিম্মায় ঐ মালের হেফাযত ওয়াজিব হইয়াছে। সেও যদি চলিয়া যায় আর মালটা খোয়া যায়, তবে সে দায়ীও হইবে, পাপীও হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যাহার নিকট যে মাল আমানত থাকিবে, সে মালের হেফাযত সে নিজেই করিবে ; সে নিজেই তার জন্য দায়ী। অবশ্য পরিবারের মধ্যে স্ত্রীর কাছে, মায়ের কাছে, মেয়ের কাছে বা এরূপ অন্য কারুর কাছে—যাদের উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে এবং যাদের কাছে সে নিজের টাকা-পয়সা সচরাচর রাখে, তাদের কাছে এই আমানতের মাল রাখিতে পারিবে। কিন্তু পরিবারস্থ যাহাকে সে আমানতদার বলিয়া মনে করে না, তাদের কাছে উহা হেফাযতের জন্য রাখা যাইবে না। পরিবারস্থ যাহাকে সে পূর্ণ বিশ্বাস করে না, এমন লোকের কাছে রাখিলে যদি মাল খোয়া যায়, তবে ভর্তুক দিতে হইবে। মালের হেফাযতের জন্য আমানতদাতার এতদ্ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয় বা বন্ধুর নিকট মালের মালিকের বিনা অনুমতিতে রাখিতে পারিবে না। যদি রাখে আর খোয়া যায় তবে ভর্তুক দিতে হইবে। অবশ্য যদি এমন কোন বন্ধু বা বিশ্বস্ত আত্মীয় থাকে, যার কাছে সে নিজের টাকাও রাখে, তবে তার কাছে (মালিকের অনুমতি না লইয়াই) রাখিতে পারিবে।

৫। **মাসআলা ঃ** কেহ আপনার নিকট কোন মাল আমানত রাখিল। আপনি ভুলে মাল ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, ঐ মাল পরে খোয়া গেল। এ মালের জন্য আপনি দায়ী হইবেন এবং ভর্তুক দিতে হইবে। অথবা ঐ মাল বাক্সে, সিন্দুকে বা আলমারিতে রাখিয়া চাবি না দিয়া চলিয়া গেলেন (অথচ তথায় নানা প্রকারের লোকজন উপস্থিত ছিল।) জিনিসটাও এমন যে, সাধারণতঃ তালা বন্ধ না করিলে হেফাযত হয় না। ফলে ঐ আমানতের মাল খোয়া গেলে ভর্তুক দিতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** আপনার কাছে কাহারো কোন মাল আমানত ছিল, ঘটনাক্রমে আপনার বাড়ীতে আগুন লাগিয়া গেল, এমতাবস্থায় যদি আমানতের মালটা আপনি বাহির করিতে পারিয়া থাকেন, তবে আপনার পড়শীর বাড়ীতে নিয়া ঐ মালটা আমানত রাখিতে পারেন। কিন্তু ওযর চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই আবার সে মাল আপনার ফিরাইয়া আনিয়া হেফাযত করিতে হইবে। এইরূপে হঠাৎ যদি মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে আপনি কাহাকেও না পাইলে, যাহাকে পান তাহার কাছে রাখিয়া যাইতে পারেন।

৭। **মাসআলা ঃ** কেহ কোন টাকা-পয়সা আমানত রাখিলে অবিকল সেই টাকা পয়সাই পৃথকভাবে হেফাযত করিয়া রাখা ওয়াজিব। নিজের টাকার সঙ্গে ঐ টাকা মিশান জায়েয নাই এবং ঐ টাকার থেকে খরচ করাও জায়েয নাই। এইরূপ মনে করিবেন না যে, টাকায় টাকায় ত সমান, খরচ করিয়া ফেলি, পরে যখন চাহিবে, তখন দিয়া দিব। যদি এরূপ করিতে হয় তবে মালিকের নিকট হইতে এজাযত লইতে হইবে। তবে যদি অবিকল সেই পয়সা পৃথকভাবে পোটলা বাঁধিয়া পূর্ণ হেফাযতের সহিত রাখিয়া থাকেন এবং তা সত্ত্বেও চুরি হইয়া যায় বা আগুনে

জ্বলিয়া বা নদীতে ডুবিয়া যাইয়া থাকে, তবে আপনার ভর্তুক দিতে হইবে না। আর যদি এজাযত লইয়া খরচ করিয়া থাকেন বা মিশাইয়া থাকেন, তবে ঐ টাকা আপনার জিম্মায় করয হইয়া যাইবে; ঘর পুড়িয়া বা নদীতে ডুবিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও আপনি দায়ী থাকিবেন; তাহার মাল যাইবে না, যাইবে আপনার মাল। আপনি এমনকি খরচ করার পর যদি পৃথক করিয়া তাহার জন্য টাকা রাখিয়াও থাকেন, তবুও দায়ী থাকিবেন। মালিকের হাতে না পৌঁছান পর্যন্ত আপনিই জিম্মাদার থাকিবেন।

৮। **মাসআলা ঃ** আপনার নিকট কেহ একশত টাকা আমানত রাখিয়াছে। আপনি মালিকের অনুমতিতে তার মধ্য হইতে ৫০ টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন আর বাকী ৫০ টাকা যেমন ছিল তেমনই পৃথকভাবে হেফাযতে আছে। তারপর আপনার হাতে টাকা আসিয়াছে। (এখন ৫০ টাকা পূর্ণ করিয়া রাখিতে চাহেন) তবে এই ৫০ টাকা আগের ৫০ টাকার সঙ্গে মিশাইবেন না। কারণ, এই ৫০ টাকা করযের এবং আগের ৫০ টাকা আমানতের। যদি মিশাইয়া ফেলেন, তবে সব টাকা করযের হইয়া যাইবে এবং আপনি সব টাকার করযের জিম্মাদার হইবেন।

৯। **মাসআলা ঃ** আপনি আমানতকারীর এজাযত লইয়া তার ১০০ টাকা আপনার ১০০ টাকার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। এখন ঐ মোট ২০০ টাকা আপনারা দুইজনে সমান সমান শরীকী ভাগে মালিক হইয়াছেন। যদি চুরি হইয়া যায়, তবে দুই জনেরই যাইবে, আর যদি অর্ধেক চুরি হয়, তবে সেই অর্ধেকের অর্ধেক যাইবে তার এবং অর্ধেক যাইবে আপনার। আর যদি তার হয় ১০০ টাকা এবং আপনার হয় ২০০ টাকা, তবে তার যাইবে তিন ভাগের একভাগ এবং আপনার যাইবে তিন ভাগের দুই ভাগ। এজাযত লইয়া মিশাইলে মাসআলা এরূপ হইবে। আর বিনা এজাযতে মিশাইলে কি হইবে সে মাসআলা উপরে বলা হইয়াছে। আমানতের টাকা বিনা অনুমতিতে মিশাইলে করয হইয়া যায়, এখন আর উহা আমানত থাকে না, যাহা খোয়া গেল তোমার গেল, তাহার টাকা তাহাকে দিতেই হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ গাই বা বকরী আমানত রাখে, তবে মালিকের বিনা এজাযতে তার দুধ খাওয়া বা বিনা এজাযতে গরুর দ্বারা (হালচাষ করা) আমানতদারের পক্ষে আদৌ জায়েয নাই। মালিকের এজাযত থাকিলে জায়েয হইবে, বিনা এজাযতে দুধ খাইয়া থাকিলে তার দাম মালিককে ফেরত দিতে হইবে।

১১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কাহারও নিকট জেওর, কাপড়, হাড়ি-পাতিল বা বাসন-বরতন আমানত রাখে, তবে মালিকের বিনা অনুমতিতে আমানতদারের পক্ষে তাহা ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। যদি এরূপ বিনা এজাযতে ব্যবহার করা অবস্থায় ঐ জিনিস চুরি হয় বা নষ্ট হয়, তবে তার জন্য ক্ষতিপূরণ বা ভর্তুক দিতে হইবে। অবশ্য যদি (মাসআলা) জানার পরে, হুশ আসার পরে তওবা করিয়া যেমন ছিল তেমন আলগ করিয়া হেফাযত করিয়া রাখিয়া দেয় এবং তারপরে চুরি হইয়া যায়, তবে ভর্তুক দিতে হইবে না।

১২। **মাসআলা ঃ** সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া পরের আমানতের কাপড় এইজন্য রাখিয়া দেওয়া হইল যে, সন্ধ্যার সময় ঐ কাপড় পরিয়া বেড়াইতে যাওয়া হইবে। পরে সন্ধ্যার আগেই ঐ কাপড় চুরি হইয়া গেল। এরূপ অবস্থায় আমানতদারকে ভর্তুক দিতে হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ আমানতের গরু কিংবা বকরী রোগাক্রান্ত হইলে আপনি তাহার চিকিৎসার্থে ঔষধ ব্যবহার করাইয়াছেন। সেই ঔষধে ঐ জীব মরিয়া গেল, তবে ভর্তুক দিতে হইবে । আর যদি ঔষধ ব্যবহার না করান, আর ঐ জীব মরিয়া যায়, তবে আপনার ভর্তুক দিতে হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ কেহ আমানতস্বরূপ আপনাকে টাকা দিল, আপনি ব্যাগে কিম্বা পকেটে রাখিয়া দিলেন, কিন্তু রাখিবার সময় সেই টাকা ব্যাগে কিম্বা পকেটে পড়ে নাই; বরং নীচে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আপনি মনে করিয়াছেন যে, ব্যাগে রাখিয়াছি, তবে ভর্তুক দিতে হইবে না।

১৫। মাসআলা ঃ আমানতের মাল যখনই আমানতকারী (মালিক) চাহিবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। বিনা ওযরে না দেওয়া বা দেরী করা জায়েয নাই। একজন আপনার নিকট কিছু মাল আমানত রাখিয়াছিল। সে আসিয়া চাহিলে আপনি বলিলেন, 'ভাই, এখন অবসর নাই। আগামীকাল আপনি নিবেন।' ইহাতে যদি সে 'বহুত আচ্ছা' বলিয়া রাযী হইয়া যায়, তবে ত ভাল, নতুবা যদি সে নারায হইয়া রাগ করিয়া চলিয়া যায়, তবে ঐ মাল আর আমানত রহিল না, খিয়ানত হইয়া গেল। এখন যদি ঐ মাল চুরি হইয়া যায় বা নষ্ট হইয়া যায়, তবে আপনার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ একজনে আপনার নিকট কোন মাল আমানত রাখিয়াছিল। কিন্তু নেওয়ার সময় আমানতকারী নিজে না আসিয়া, নেওয়ার জন্য অন্য লোক পাঠাইয়াছে। এখন এই অন্য লোকের কাছে দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছা। আপনি তাহাকে না দিয়া ইহাও বলিয়া দিতে পারেন যে, মালিক নিজে না আসিলে আমি অন্য কাহারও কাছে দিব না। কেননা, আপনি যদি বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট দিয়া দেন, আর যদি মালিক অস্বীকার করে যে, সে তাহাকে পাঠায় নাই; তবে মালিক আপনার কাছ থেকে মাল আদায় করিয়া নিতে পারিবে। অবশ্য আপনি যাহাকে মাল দিয়াছেন, তাহাকে পাইলে তাহার নিকট হইতে মাল ফেরত নিতে পারিবেন। আর যদি কেহ আপনাকে ফাঁকি দিয়া থাকে, তবে সে ফাঁকিতে আপনি পড়িলেন; মালিকের মালের ক্ষতিপূরণ আপনাকে অবশ্যই দিতে হইবে।

আরিয়াত নেওয়ার বিবরণ

(একজনের একটা জিনিস থাকে। তার নিকট থেকে সে জিনিস নিয়া পাড়াপ্রতিবেশীও অনেক সময় কাজ চালায় এবং কাজ সারিয়া জিনিস আবার ফেরত দেয়। এইরূপ চাহিয়া নেওয়াকে 'আ'রিয়াত' বলে। আ'রিয়াত দেওয়াতে বড় সওয়াব পাওয়া যায়। আ'রিয়াতের মালের হেফাযত খুব বেশী করিয়া করিতে হয় এবং আ'রিয়াতদাতার এহ্সানও স্বীকার করিতে হয়। এই মালের যথাযথ হেফাযত না করিলে আমানতে খিয়ানতের গোনাহ্ হইবে। বাড়ীর দৈনন্দিন ব্যবহারের সাধারণ জিনিস 'আ'রিয়াত না দেওয়া অত্যন্ত দূষণীয় এবং বড় বখিলীর পরিচায়ক। কোরআন শরীফে এরূপ লোকের বড় নিন্দা করা হইয়াছে। আ'রিয়াত না দিলে বা আ'রিয়াতের মালের হেফাযত না করিলে সমাজে হামদরদী বা সহানুভূতি থাকে না এবং সে সমাজ আল্লাহ্র রহ্মত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। —অনুবাদক)

১। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত আপনার কাছ থেকে একটা ছাতি বা একটা বদনা বা একখানা খন্তা বা একটা মই কয়েক দিনের জন্য আ'রিয়াত চাহিয়া নিল যে, কাজ সারিয়া আপনার জিনিস আপনাকে ফেরত দিয়া যাইবে। এইরূপে নেওয়ার পর সেই জিনিসের পূর্ণ হেফাযত করা তাহার

জিম্মায় ওয়াজিব হইয়া যাইবে, ঐ জিনিস তাহার নিকট এখন আমানত হইয়াছে। যদি পূর্ণ হেফাযত না করে, তবে আমানত খিয়ানতের গোনাহ্ হইবে। অবশ্য পূর্ণ হেফাযত সত্ত্বেও যদি জিনিসটি খোয়া যায়, তবে আইনত ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগিবে না। যদি ক্ষতি হইলে ভর্তুক দিবে বলিয়া নেয়, তবুও ক্ষতিপূরণ দেওয়া জায়েয নাই। আর হেফাযতে ত্রুটি করিলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

২। মাসআলা ঃ আ'রিয়াতের জিনিস মালিক যে কাজে যে ভাবে এস্তেমাল ও ব্যবহার করার অনুমতি দিয়াছে সেই কাজে সেইভাবে এস্তেমাল করা জায়েয হইবে, তাহার কিছুমাত্র খেলাফ করাও জায়েয হইবে না। খেলাফ করিলে যদি জিনিসটা নষ্ট হয়, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। যেমন, কেহ হয়ত একটা চাদর নিয়াছে গায় দিবার জন্য; কিন্তু সে ফরাসের কাজ করিল, ইহা জায়েয নহে। কিংবা ফরাসের কাজে ৩ দিন ব্যবহার করার জন্য নিয়াছে; এখন যদি ঐ চাদর অন্য কাজে ৫ দিন ব্যবহার করে—তবে তাহা জায়েয হইবে না। এইরূপ খেলাফ করার ফলে যদি চাদর ছিঁড়িয়া যায়, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। অথবা কেহ হয়ত একখানা কুরছি (চেয়ার) আ'রিয়াত নিয়াছে। কুরছি সাধারণতঃ একজন বসার জন্য হয়। কিন্তু তাহাতে দুইজন বসিয়াছে এবং তার ফলে কুরছি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; আর যদি এই নিয়তে 'আ'রিয়াত' লয় যে, ইহা আর ফিরাইয়া দিবে না, তবে যদি ক্ষতি হইয়া যায়, তখন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

৩। মাসআলা ঃ এক বা দুই দিনের জন্য কোন জিনিস চাহিয়া আনিল; এখন এক বা দুই দিন পরেই তাহা ফেরত দিতে হইবে। ওয়াদাকৃত সময়ে না দিলে যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

৪। মাসআলা ঃ আ'রিয়াতের জিনিস সম্বন্ধে মালিক যদি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিয়া থাকে যে, চাই আপনি নিজে ব্যবহার করেন বা অন্যকে ব্যবহার করিতে দেন আমার এজাযত আছে, তবে ত যে আ'রিয়াত আনিয়াছে সে নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে অথবা অন্য কোন আত্মীয় বা বন্ধুকেও দিতে পারিবে। আর যদি এমন হয় যে, মালিক এরূপ পরিষ্কার ভাষায় এজাযতের কথা বলে নাই, কিন্তু তার সাথে তার এমন বন্ধুত্ব আছে যে, তার একীনী বিশ্বাস আছে যে, মালিক নিশ্চয়ই এজাযত দিবে, তবে এই ছুরতেও ঐ হুকুম যে, নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে এবং অন্যকেও দিতে পারিবে। আর মালিক যদি পরিষ্কার ভাষায় নিষেধ করিয়া দেয় যে, শুধু আপনাকে ব্যবহার করার অনুমতি দিতেছি, অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবেন না, তবে অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেওয়া কিছুতেই দুরুস্ত হইবে না। যে আ'রিয়াত আনিয়াছে, সে যদি এই বলিয়া আনিয়া থাকে যে, সে নিজে ব্যবহার করিবে এবং মালিক পরিষ্কার ভাষায় অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার কথা নিষেধ করে নাই, তবে জিনিসটি কোন্ ধরনের তাহা দেখিতে হইবে। যদি এমন ধরনের জিনিস হয় যে, সকলের ব্যবহার সমান হয়, ব্যবহারে কোন বেশকম হয় না; তবে যে আ'রিয়াত আনিয়াছে, সে নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে এবং অন্যকেও ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে। আর যদি জিনিসটি এমন ধরনের হয় যে, সকলের ব্যবহার সমান হয় না, বরং কেহ ভালভাবে ব্যবহার করে আর কেহ খারাপভাবে ব্যবহার করে, তবে এইরূপ জিনিস যে আ'রিয়াত আনিয়াছে শুধু সে-ই ব্যবহার করিতে পারিবে, অন্যকে ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে না। এইরূপ যদি এই বলিয়া আ'রিয়াত আনা হয় যে, সে এই জিনিস তাহার অমুক আত্মীয় বা বন্ধুকে ব্যবহার

করিতে দিবে, কিন্তু মালিক কিছু না বলিয়াই জিনিসটি দিয়া দিয়াছে, তবে উপরের মাসআলার মত হইবে। অর্থাৎ যদি দেখা যায়, ঐ জিনিসটির ব্যবহার লোকের নিকট বিভিন্ন প্রকার, তবে যাহার নাম করিয়া আ'রিয়াত আনা হইয়াছে, শুধু সে-ই ব্যবহার করিতে পারিবে, এমনকি যে ব্যক্তি আ'রিয়াত আনিয়াছে, সেও ব্যবহার করিতে পারিবে না। আর যদি কহারও নাম না করিয়া, 'আ'রিয়াত আনা হইয়া থাকে আর জিনিসটি যদি এমন হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে, তবে যে-ব্যক্তি প্রথমে ব্যবহার শুরু করিয়াছে শুধু সে-ই ব্যবহার করিতে পারিবে, অন্য আর কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। আর জিনিসটি যদি এমন হয় যে, উহার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হয় না, তবে নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে এবং অন্য একজনকেও ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে।

৫। **মাসআলা ঃ** যে জিনিসের মালিক কোন না-বালেগ বাচ্চা, সে জিনিস কেহ আ'রিয়াত দিতেও পারিবে না, কেহ আ'রিয়াত নিতেও পারিবে না (না-বালেগ বাচ্চা এতীম হইলে ত কেহই পারিবে না)। এমনকি, এই বচ্চার মা-বাপ জীবিত থাকিলে তাহারাও দিতে পারিবে না। না-বালেগ বাচ্চা নিজে দিতে চাহিলেও কাহারও পক্ষে তাহা আ'রিয়াত নেওয়া জায়েয হইবে না। (না-জায়েয হওয়া সত্ত্বেও) যদি কেহ তাহার নিকট হইতে আ'রিয়াত নেয়, আর জিনিসটি নষ্ট হয় বা খোয়া যায়, তবে তার ভর্তুক দিতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** কেহ কাহারও নিকট হইতে কোন জিনিস আ'রিয়াত আনিল কিন্তু ফেরত দেওয়ার আগেই মালের মালিক মরিয়া গেল। তাহা হইলে মরিয়া যাওয়ার খবর পাওয়ামাত্রই ঐ জিনিস আর ব্যবহার করা দুরুস্ত হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিয়া আসিতে হইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি আ'রিয়াত আনিয়াছে, সে যদি (মাল ফেরত দেওয়ার আগে) মরিয়া যায়, তবে তার ওয়ারিশরা ঐ জিনিস আর ব্যবহার করিতে পারিবে না। (সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কাছে ফেরত পৌঁছাইতে হইবে।)

হেবা করার বর্ণনা

১। **মাসআলা ঃ** (কাহাকেও কোন জিনিস বিনা মূল্যে দান করার নাম হেবা করা।) আপনি কাহাকেও একটি জিনিস দান করিতে চাহেন। এ জন্য মুখে বলিলেন যে, আমি আপনাকে এই জিনিসটি দান করিলাম, সেও মুখে বলিল, আমি গ্রহণ করিলাম, ইহাতে হেবা পূর্ণ হইবে না। যাহাকে দান করা হইতেছে যাবৎ তাহার কবযা এই জিনিসের উপর না হইবে তাবৎ দান এবং গ্রহণ কিছুই পূর্ণ হইবে না। (দানের জন্য) আপনি আপনার একটি জিনিস একজনের হাতে দিলেন, সেও তাহা গ্রহণ করিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, এখন সেই জিনিসের মালিক সে হইয়া যাইবে। শরীঅতের ভাষায় ইহা 'হেবা' বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ইহার কয়েকটি শর্ত আছে। একটি হইল তাহাকে দখলে দিয়া দিতে হইবে এবং সেও দখলে নিয়া নিবে। দাতার দান করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতা (অর্থাৎ, যাহাকে দান করা হইতেছে সে) কব্যা করিয়া না নিলে হেবা হয় না। শুধু ঐ ভাবে কব্যা না করার জন্যই দাতা-গ্রহীতার কথা-বার্তা কোনই কাজে আসিবে না; পরে গ্রহীতা ঐ মাল কব্যা করিতে চাহিলে দাতার বিনা অনুমতিতে কব্যা করিতে পারিবে না।

২। **মাসআলা ঃ** দাতা গ্রহীতার সামনে এমনভাবে জিনিসটি রাখিয়া দিল যে, গ্রহীতা ইচ্ছা করিলে হাতে তুলিয়া নিতে পারে এবং বলিল যে, আপনি এই জিনিসটি গ্রহণ করুন ; এই অবস্থায় বুঝা যাইবে এবং ধরিয়া লওয়া হইবে যে, গ্রহীতা কব্‌যা করিয়া নিয়াছে।

৩। **মাসআলা ঃ** বন্ধ করা সিন্দুকের ভিতরকার কাপড় কাহাকেও দান করা হইল ; সিন্দুক সামনেই আছে, কিন্তু খুলিয়া দেওয়া হইল না বা চাবিও দেওয়া হইল না এইরূপ হইলে কব্‌যা হইল না এবং গ্রহীতা কাপড়ের মালিকও হইল না। চাবি দেওয়া হইলে গ্রহীতা মালিক হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** আপনি কাহাকেও একটি বোতল দান করিলেন ; কিন্তু বোতলে আপনার তেল রাখা আছে ; তবে তেল আপনি রাখিয়া বোতল না দেওয়া পর্যন্ত আপনার দান করা কার্য পূর্ণ হইবে না, গ্রহীতারও স্বত্বাধিকার প্রমাণিত হইবে না। কিন্তু যদি বোতলে করিয়া তেল দান করেন আর বোতল না দান করেন, তবে দান কার্য পূর্ণ হইয়া যাইবে। গ্রহীতা তেল রাখিয়া বোতল আপনাকে ফেরত দিবে। ঠিক এইরূপে আপনি একটি বাড়ী দান করিলেন, কিন্তু ঐ বাড়ীতে আপনার আসবাবপত্র রাখা আছে, যাবৎ আপনি বাড়ী খালি করিয়া না দিবেন তাবৎ দানকার্য পূর্ণ হইবে না গ্রহীতারও স্বত্বাধিকার প্রমাণিত হইবে না ; যখন খালি করিয়া দখল দিয়া হস্তগত করাইয়া দিবেন তখন গ্রহীতার স্বত্ব প্রমাণিত হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** কোন জিনিসের অর্ধেক বা কিছু অংশ কাহাকেও দান করিলে দেখিতে হইবে যে, ঐ জিনিস ভাগ করিতে পারা যায় কি না। অর্থাৎ ভাগ হওয়ার পরেও জিনিসটা (আগের মত) কাজের থাকে কি না। যদি ভাগ হওয়ার পরে কাজের থাকে, তবে ভাগ করিয়া দান করিলে দান কার্য পূর্ণ হইয়া যাইবে, নতুবা হইবে না। আর যদি জিনিসটি এমন হয় যে, ভাগ করার পর কাজের থাকে না, তবে (দান করার পরে) ঐ জিনিসটি শরীকী অংশ হিসাবে দুইজনের হইবে। যদি আপনি কাহাকেও বলেন, এই বর্তনের অর্ধেক ঘি আপনাকে দিলাম। সে বলিল, আমি নিলাম। এই দান ছহীহ্ হইবে না, যদিও বর্তন দখল করিয়া লয়। কিন্তু ঐ ঘি-এর মালিক আপনিই থাকিবেন। অবশ্য যদি অর্ধেক ঘি পৃথক করিয়া তাহাকে দিয়া দেন, তবে সে উহার মালিক হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** এক থান কাপড়, এক খণ্ড জমি বা একটি বাগিচা দুই জনে শরীকী অংশ হিসাবে ক্রয় করিয়া একজনের অংশ ভাগ করিয়া না আনিয়া কাহাকেও দান করিলে সে দান কার্য সম্পূর্ণ হইবে না। বণ্টন করিয়া নেওয়ার পর দানকার্য করা উচিত।

(জ্ঞাতব্য—জমিনের উপর কব্‌যার নিয়ম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরূপে দেখা যায়। কোথাও কব্‌যা হয় জমিনের চার আইল দিয়া হাঁটিয়া আসিলে, আবার কোথাও চাষবাস করিলে ইত্যাদি।)

—অনুবাদক

৭। **মাসআলা ঃ** আট আনা কিংবা বার আনা পয়সা দুইজনকে দিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়েই আধাআধি ভাগ করিয়া নেও। ইহা ছহীহ্ নহে বরং ভাগ করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য যদি তাহারা ফকীর হয়, তবে ভাগ করার প্রয়োজন নাই। যদি একটি টাকা বা একটি পয়সা দুইজনকে দেওয়া হয়, তবে এই দান ছহীহ্ হইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** বকরী বা গাভীর পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ঐ বাচ্চা দান করা ছহীহ্ নহে। বাচ্চা পয়দা হওয়ার পর উহা কব্‌যা করিলেও মালিক হইবে না। বাচ্চা দান করিতে হইলে বাচ্চা পয়দা হওয়ার পর নূতন ভাবে দান করিবে।

৯। মাসআলা ঃ বকরী বা গাভীর পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ঐ বকরী বা গাভী যদি কেহ দান করিয়া দেয় আর বলে যে, উহার পেটে যে বাচ্চা আছে, ঐ বাচ্চা দান করিলাম না—ইহা আমারই থাকিবে, তবে এইরূপ দুরুস্ত হইবে না। (এবং বলায় কোন কাজও হইবে না), বাচ্চাসহ বকরী বা গাভী গ্রহীতার হইয়া যাইবে।

১০। মাসআলা ঃ আপনার কোন জিনিস কাহারও নিকট আমানত রাখা আছে বা পাওনা আছে। এখন ঐ জিনিসই তাহাকে দান করিতে হইলে শুধু মুখে বলিয়া দিলে দান কার্য পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ঐ জিনিস তাহার হইয়া যাইবে। তাহাকে নূতন করিয়া কব্যা করাইতে হইবে না।

১১। মাসআলা ঃ না-বালেগ ছেলেমেয়ে যদি তাহাদের জিনিস কাহাকেও দান করে, তবে এইরূপ দান করাও দুরুস্ত হইবে না আর নেওয়া ত দুরুস্ত হইবেই না।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য—শরীঅতের মাসআলা এই যে, ছেলেমেয়েদেরকে যেরূপ দ্বীন-ঈমান এবং ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়া ফরয, আল্লাহ্ রাসূল সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া ফরয, তদ্রূপ দান-ছাখাওতির শিক্ষা দেওয়াও ফরয। সেই দান-ছাখাওতি এইভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, নিজেদের জিনিস তাহাদের হাতে দিয়া দেওয়াইতে হইবে, যাহাতে তাহাদের দান করার এবং খেদমত করার অভ্যাস হয়। দান-ছাখাওতির অভ্যাস করা ও অভ্যাস করান অত্যন্ত জরুরী।

(বিনামূল্যে) দান কয়েক প্রকারের হয়—

১। গরীবকে ছওয়াবের নিয়তে দান করা। ইহাকে ছদ্কা বলে। ছদ্কা আবার দুই প্রকার, যথা—(১) ওয়াজিব ছদ্কা ও (২) নফল ছদ্কা।

২। স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ বড়র পক্ষ হইতে ছোটকে দান করা। যেমন, স্বামী স্ত্রীকে দান করে, বাপ বেটাকে দান করে। এই প্রকার দানকে সাধারণতঃ হেবা বলে।

৩। ভক্তি ও মহব্বত সহকারে ছোটর পক্ষ হইতে বড়কে দান করা বা ভালবাসার নিদর্শন-স্বরূপ এক দোস্তের পক্ষ হইতে অন্য দোস্তকে দান করা।—যেমন, বেটা মা-বাপকে, শাগরেদ-মুরিদ ওস্তাদ বা পীরকে দান করে। এই প্রকার দানকে সাধারণতঃ হাদিয়া বা তোহ্ফা বলে।

প্রকাশ থাকে যে, হেবার জন্য যে সকল মাসআলা বলা হইয়াছে তাহা এই তিন প্রকার দানের জন্যও প্রয়োজন হইবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) দান-ছাখাওতি করার জন্য অনেক তাকীদ করিয়া গিয়াছেন; গরীবদিগকে ছদ্কা দেওয়ার জন্যও খুব তাকীদ করিয়াছেন। মা-বাপ ওস্তাদ পীরকে এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব একে অন্যকে হাদিয়া-তোহ্ফা দেওয়া-নেওয়ার প্রথা জারি রাখার জন্যও তাকীদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ تَهَادَوْا وَتَحَابُّوْا

"তোমরা একে অন্যকে হাদিয়া তোহ্ফা দান কর এবং এইভাবে পরস্পরের মধ্যে মহব্বত ও ভালবাসা বাড়াও।" —অনুবাদক)

হাদিয়ার মাসআলা (বর্ধিত)

হাদিয়া ও ঘুষ-রেশওয়াতের মধ্যে পার্থক্য

১। মাসআলা ঃ হাদিয়া এবং রেশওয়াত দেখিতে প্রায় এক রকম দেখায় এবং সাধারণতঃ যারা ঘুষ দেয়, তাহারা উহাকে তোহ্ফা, নাজরানা, ডালি বা ভালবাসার নিদর্শন বলিয়া প্রকাশ

করিতে চায়। তাহারা এরূপ বলে, পান খাইতে দিলাম, ছেলেকে, মাকে মিঠাই বা নাশ্‌তা খাইবার জন্য দিলাম ইত্যাদি। ইহা দ্বারা হাদিয়া এবং রেশওয়াতের পার্থক্য সাধারণতঃ লোকের বুঝে আসে না। কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে আসমান-জমিনের পার্থক্য আছে। প্রথম বড় পার্থক্য এই যে, হাদিয়া দেওয়ার নিয়তের মধ্যে এক আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের মহব্বত ছাড়া দুনিয়ার কোন গরয, স্বার্থ বা কোনরূপ কোন সাহায্য পাওয়ার আশা থাকে না। পক্ষান্তরে রেশওয়াত দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে কিছু গরয বা স্বার্থ হাছিল করা এবং কিছু সাহায্য পাওয়া। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, হুকুমত পাবলিকের কাছ থেকে ট্যাক্স বসাইয়া টাকা আদায় করিয়া পাবলিকেরই খেদমত করার জন্য বেতন দিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করে। এইসব বেতনভোগী কর্মচারীদের উপর ওয়াজিব এই যে, পাবলিকের যে কাজের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই কাজ করিয়া দিতে হইবে। পাবলিকের নিকট হইতে সে উপরি কিছু গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে কষ্ট দিতে পারিবে না, তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ খোশামোদ তোষামোদের আশা করিতে পারিবে না। সবাইকেই সমান চোখে দেখিয়া নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে তাহাদের কাজ করিয়া দিতে হইবে। এই বেতনভোগী কর্মচারীরা যদি তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় পাবলিকের নিকট হইতে পার্টি লয়, পাবলিকের বাড়ীতে দাওয়াত খায়, পাবলিকের নিকট হইতে কোন হাদিয়া তোহ্‌ফা গ্রহণ করে বা তাহাদের ছেলে-মেয়ে বা স্ত্রী মিঠাই খাবার বা নাশ্‌তা খাবার গ্রহণ করে, তবে তাহা সব ঘুষ বা রেশওয়াত হইবে, হারাম হইবে, আমানতে খেয়ানত হইবে, গোনাহ্‌ কবীরা হইবে।

পক্ষান্তরে মা-বাপ, ওস্তাদ-পীর—যাহাদের এহ্‌সান শুমার করা যায় না, যাহারা আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দেন, যাহারা ওয়ায নছীহত করিয়া আখেরাতের নাজাতের পথ বাতাইয়া থাকেন, যাহারা মসজিদে ইমামতী করিয়া নামায পড়াইয়া আখেরাতের বড় পুঁজি সংগ্রহের কাজে সাহায্য করিয়া থাকেন, যাহারা ফতুয়া দিয়া ও মাসআলা বাতাইয়া ধর্মমতে সমস্যার সমাধান করিয়া দেন, যাহারা ইসলামী শিক্ষা দান করিয়া কোরআন হাদীস পড়াইয়া, কোরআন হাদীসের সত্যকে প্রচার করিয়া ইসলাম ধর্মকে চিরজীবন্ত করিয়া রাখিতেছেন—হুকুমতের পক্ষ হইতে যখন ইহাদের কাহারো জন্য কোন বেতন নাই, তখন তাহাদিগকে দান করিয়া কোন কাজ উদ্ধার করিয়া নেওয়ার আশা নাই; কাজেই তাহাদিগকে হাদিয়া তোহ্‌ফা দান করা রেশওয়াত নহে; বরং অতি বড় পুণ্যের কাজ এবং অতি বেশী ছওয়াবের কাজ। কেননা, তাহাদিগকে যাহাকিছু দান করা হয়, তাহা শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র মহব্বতে দান করা হয়। অন্য কোন উদ্দেশ্যে দান করা হয় না।

২। মাসআলা ঃ শাসনকর্তা, বিচারকর্তা, পুলিশ, তহ্‌শীলদার, আমীন, সেরেশ্‌তাদার পেশকার, কেরানী—এরা সবাই হুকুমতের পক্ষ হইতে পাবলিকের কাজ করিয়া দেওয়ার জন্য বেতনভোগী কর্মচারী। কাজেই ইহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং এমন বন্ধু যাহাদের সঙ্গে চাকুরীর আগে হইতেই দেওয়া-নেওয়ার ও খাওয়া-খাওয়াইবার প্রথা ছিল তাহা ছাড়া অন্য কাহারও দাওয়াত গ্রহণ করা, হাদিয়া তোহ্‌ফা গ্রহণ করা, করয লওয়া আ'রিয়াত লওয়া এবং এছাড়া অফিসের চাকরের দ্বারা বা অফিসের জিনিসের দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজ লওয়া সবই রেশওয়াতের মধ্যে শামিল এবং সম্পূর্ণরূপে হারাম। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও পুরাতন বন্ধুও বাদী বা বিবাদী হয়, তবে তাহাদের থেকেও কিছু গ্রহণ করা হারাম। এইরূপে গ্রাম্য যেসব পঞ্চায়েতের হাতে কোন সালিসী বিচার ইত্যাদি থাকে, তাহাদের জন্যও বাদী বা বিবাদী পক্ষের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা বা দাওয়াত ইত্যাদি খাওয়া সবই ঘুষ এবং রেশওয়াত হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** মুফতী ছাহেব—যিনি ফতওয়া দেন, তিনি—যদি টাকা পাইয়া বা দাওয়াত লইয়া পক্ষপাতিত্ব করেন, তবে তাঁহার পক্ষেও কিছু গ্রহণ করা রেশওয়াতের অন্তর্গত এবং হারাম। আর যদি মাসআলা বাতানের পারিশ্রমিকস্বরূপ গ্রহণ করেন, তবে তাহাও তাহার পক্ষে হালাল নহে। অবশ্য তিনি যদি হক্ ফতওয়া দেন এবং লোকে এলমের মহব্বতে আল্লাহ্ রাসূলের মহব্বতে তাঁহাকে নায়েবে রাসূল ও দ্বীনের খাদেম মনে করিয়া হাদিয়া তোহ্ফা দেয়, তবে তাহা অতি বড় নেকের কাজ হইবে এবং তাহা গ্রহণ করা আওলা ও আফযাল হইবে।

অবশ্য ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, শরীঅতের মাসআলা মৌখিক বাতানের উজরত হালাল নহে; কিন্তু উহা কাগজে কলমে লিখিয়া দিয়া তাহার উজরত নেওয়া হালাল।

৪। **মাসআলা ঃ** রমযান মাসে হাফেয ছাহেব তারাবীহ্র খতম পড়েন। যদি তিনি চুক্তি করিয়া খতমের উজরত লন, তবে তাহা তাহার পক্ষে হালাল নহে। কিন্তু জনসাধারণ যদি কোরআনের মহব্বতে আল্লাহ্ রাসূলের মহব্বতে হাফেযে কোরআনের সম্মানার্থে হাদিয়া তোহ্ফা স্বরূপ টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় বা দুধ-ঘি দান করে, তবে তাহারা আল্লাহ্র খাছ রহ্মতের পাত্র হইবে এবং আল্লাহ্র কাছে অনেক বেশী নেকী পাইবে। আর হাফেয ছাহেব যদি দেলে কোন লোভ না আনিয়া দেলকে পবিত্র রাখিয়া দেলের মধ্যে শুধু আল্লাহ্র এবং কোরআনের প্রতি ভক্তি ও মহব্বত রাখিয়া উহা গ্রহণ করেন, তবে তাহার জন্য তাহা হালাল হইবে; কিন্তু দেলের মধ্যে লোভ রাখিলে সে মালে বরকত ও রহ্মত থাকিবে না।

৫। **মাসাআলা ঃ** পীর মামলা জিতাইয়া দিবে, পীর রোগ ভাল করিয়া দিবে, পীর বিপদ দূর করিয়া দিবে, পীর দোকানে, ক্ষেতে বা চাকুরীতে বরকত দিয়া দিবে—এইরূপ আকীদা রাখা শেরেকী গোনাহ্ এবং এইরূপ আকীদা রাখিয়া যদি কেহ হাদিয়া বা নযরানা দেয়, তবে তাহা (দেওয়া অন্যায় এবং) গ্রহণ করাও গোনাহ্।

(মোকদ্দমায় জিতাইয়া দেওয়া, রোগ ভাল করিয়া দেওয়া, বিপদ দূর করিয়া দেওয়া, দোকানে , ক্ষেতে বা চাকুরীতে বরকত দেওয়া—এগুলি পীরের কাজ নয়, এগুলি আল্লাহ্র হাতের কাজ। মানুষকে আল্লাহ্ নিয়মিতভাবে চেষ্টা করিবার হুকুম দিয়াছেন। নিয়মানুসারে চেষ্টা হইলে চেষ্টার ফল দেওয়া আল্লাহ্র কাজ, চেষ্টার সঙ্গে দো'আও যদি যোগ হয়, বিশেষ করিয়া যদি নেক লোকদের দো'আ যোগ হয়, তবে চেষ্টা আরো বেশী ফলবতী হয়। পীর ছাহেব দো'আ করিতে পারেন বটে, কিন্তু দো'আর জন্য কোন টাকা লাগে না; আর পীরের আসল কাজ ত হইল লোকের নৈতিক চরিত্র ঠিক করিয়া দিয়া লোকদিগকে আল্লাহ্র পেয়ারা করিয়া দেওয়া এবং আল্লাহ্কে চিনাইয়া দিয়া আল্লাহ্কে লোকের কাছে পেয়ারা করিয়া দেওয়া। আল্লাহ্র মহব্বতের কারণে যদি আল্লাহ্র পেয়ারা নেক বান্দাদের সঙ্গে মহব্বত রাখে এবং সেই মহব্বতের কারণে হাদিয়া তোহ্ফা দেয়, তবে তা অতি বড় নেক কাজ। এই নেক কাজ হয় চারি কারণে। যথা—(১) আল্লাহ্র মহব্বতের পরিচয় এবং প্রমাণ পাওয়া যায় দানের দ্বারা। (২) যাহারা আল্লাহ্র মহব্বতের লোক তাহাদের সহিত মহব্বত করার হুকুম আল্লাহ্ তা'আলা করিয়াছেন, সেই মহব্বতের পরিচয় পাওয়া যায় হাদিয়া তোহ্ফার দ্বারা। (৩) আল্লাহ্র দ্বীনকে জারি করার কাজে সহায়তা করা হইবে এই দানের দ্বারা। (৪) এই আশা থাকে যে—

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ ○ لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

"নিজে যখন ভাল হইতে পারি নাই, তখন ভাল লোকদিগকে এই জন্য ভালবাসি যে, আল্লাহ্ তা'আলা (হাদিয়া মারফতে) এই ভালবাসার কারণে আমাকেও ভাল বানাইতে পারেন।"

সমাজে ন্যায় বিচার কায়েম করা, সামজের দুষ্টদের দমন করিয়া শিষ্টদের পালন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা, যাহাতে সমাজের মধ্যে শান্তিভঙ্গ না হয়, সেজন্য শান্তি রক্ষার চেষ্টা করা, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বদমাআশী ইত্যাদি না হইতে দেওয়া, রোগীর চিকিৎসা এবং সেবা করা, পথ-ঘাট, পুল ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া দিয়া লোকের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া, লোকের স্বাস্থ্য যাহাতে নষ্ট না হয় এবং ভাল থাকে সেজন্য চেষ্টা করা—এগুলি সবই বড় বড় নেক কাজ, যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয় এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেরা মানুষের সেবার নিয়তে করা হয়; প্রকৃত প্রস্তাবে এইসব কাজ এত বড় নেকের কাজ যে, এর কোন উজরত বা বেতন হইতে পারে না। কিন্তু যাহারা এই সমস্ত বিভাগে কাজ করেন, তাঁহারা যেহেতু জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজেদের সমস্ত সময়টুকু উৎসর্গ করিয়া রাখেন, সেইজন্য জনগণের যে টাকা সরকারের নিকট থাকে, সেই টাকা হইতে তাহাদিগকে ভাতা বা বেতন স্বরূপ কিছু দেওয়া হয়। আর যেহেতু বেতন দেওয়া হয়, সেইজন্য জনগণের নিকট হইতে হাদিয়া তোহ্‌ফা গ্রহণ করা তাহাদের জন্য নাজায়েয হইয়া যায়। কিন্তু এইসব নেক কাজের চেয়ে আরো অনেক বড় নেকের কাজ হইতেছে আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলামের শিক্ষাকে চালু রাখা। আল্লাহ্‌র রাসূলের কোরআন হাদীস শিক্ষাকে জারি রাখা। হুকুমতের উচিত এই যে, যাহারা এই কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে ভাতা দেওয়া। কিন্তু যেহেতু হুকুমত তাহার কিছুই করিতেছে না, কাজেই জনগণের উপর ফরয হইতেছে তাহাদিগকে হাদিয়া তোহ্‌ফা স্বরূপ দান করিয়া হউক বা সমিতি কমিটি করিয়া মাসিক ভাতা নির্ধারিত করিয়া হউক তাঁহাদের খেদমত করা এবং এই উছিলায় আল্লাহ্‌র কোরআন ও রাসূলের হাদীস শিক্ষাকে জারি রাখা। —অনুবাদক)

বাচ্চাকে দান করার মাসআলা

১। মাসআলঃ ছেলে জন্মিলে ছেলেকে দেখিয়া বা ছেলের খত্‌নার সময় আত্মীয়-স্বজনগণ বা শাগরেদ মুরীদগণ ছেলেকে যে টাকা দেয়, সে টাকা সাধারণতঃ ছেলেকে দেওয়া মকছুদ হয় না—ছেলের মা-বাপকেই সন্তুষ্ট করা মকছুদ হয়। সুতরাং এইসব টাকার মালিক ছেলে নহে, বরং মা-বাপ মালিক হইবে। অবশ্য যদি কেহ খাছ করিয়া বাচ্চাকেই দেওয়া মকছুদ বলিয়া উল্লেখ করিয়া দেয় বা বাচ্চার ব্যবহারের জিনিস দেয়, তবে বাচ্চাই তার মালিক হইবে। বাচ্চার যদি দেওয়া নেওয়ার বুঝ-বুদ্ধি হইয়া থাকে, তবে বাচ্চার হাতে দিলেই বাচ্চার কব্‌যা হইয়া যাইবে এবং বাচ্চা মালিক হইয়া যাইবে। আর বাচ্চা যদি অবুঝ হয়, তবে বাচ্চার পক্ষ হইতে বাপ কবযা করিলে বা বাপের অবর্তমানে দাদা কব্‌যা করিলে বা বাপের পক্ষে অছি বা দাদার পক্ষের অছি কব্‌যা করিলে অথবা ইহারা না থাকিলে বাচ্চা যার তত্ত্বাবধানে আছে (চাই সে মা হউক, ভাই হউক, চাচা হউক, বা মামা হউক, বা অন্য কেহ হউক,) সে কব্‌যা করিয়া লইলে বাচ্চা মালিক হইয়া যাইবে। বাপ দাদা বর্তমান থাকিতে মা, নানা, দাদী ইত্যাদি কব্‌যা করিলে ছহীহ্ হইবে না।

২। মাসআলাঃ বাপ-দাদা বা বাচ্চা যাহার তত্ত্বাবধানে আছে, সে নিজেই যদি বাচ্চাকে কিছু দিতে চায়, তবে যদি শুধু এতটুকু বলে যে, 'আমি বাচ্চাকে এই মালটা দিলাম' তাহা হইলে বাচ্চা সেই মালের মালিক হইয়া যাইবে। কব্‌যা করার প্রয়োজন নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** বাপ মা (যদি কোন মেয়েকে বা কোন ছেলেকে বেশী ভালবাসে তাহাতে গোনাহ্ নাই, কিন্তু) কোন জিনিস দিতে হইলে সব ছেলেমেয়েকেই সমান দিতে হইবে; বিনা কারণে বেশ-কম করা মাকরূহ্। উপযুক্ত কারণবশতঃ (যেমন, যদি কোন ছেলে দ্বীনের খাদেম, আলেম বা হাফেয হয় বা মা-বাপের বেশী খেদমত করে বা কামাই রোজগারের উপযুক্ত না হয়, তবে এই কারণে) বেশী দিলে কোন গোনাহ্ হইবে না, যদি যাহাকে কম দিয়াছে তাহার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না হয়।

৪। **মাসআলা ঃ** যে জিনিসের মালিক কোন না-বালেগ বাচ্চা, সেই জিনিস শুধু ঐ বাচ্চারই কাজে লাগাইতে হইবে, অন্য কাহারো কাজে সেই জিনিস ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। এমন কি, মা-বাপও সে জিনিস নিজেদের কাজে বা এক বাচ্চার জিনিস অন্য বাচ্চার কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** (ফল ফলাদি, মিঠাই বা এই ধরনের) কোন (খাবার) জিনিস যদি কেহ বাচ্চার নাম করিয়া দেয় বা বাচ্চার হাতে দেয়, অথচ নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, আসল মাকছুদ মা-বাপকে দেওয়া কিন্তু সামান্য জিনিস মনে করিয়া বাচ্চার নাম করিয়াছে (তাহা হইলে ঐ জিনিস মা-বাপেও খাইতে পারিবে)। যদি মায়ের পক্ষের আত্মীয়গণ দিয়া থাকেন, তবে মা মালিক হইবে; আর যদি বাপের পক্ষের আত্মীয়গণ বা শাগরেদ মুরীদগণ দিয়া থাকেন, তবে বাপ মলিক হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** মা-বাপ যদি নিজেদের ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য জেওর বা কাপড় বানায়, তবে যাহার নামে সেটা বানাইবে সেটার মালিক সে হইয়া যাইবে; এখন আর অন্য কাহাকেও দেওয়া জায়েয হইবে না। অবশ্য মা বা বাপ যদি স্পষ্টভাবে বলিয়া দেয় যে, জিনিস আমার রহিল, ছেলে বা মেয়েকে শুধু ব্যবহার করার জন্য দিলাম, তবে সে জিনিস অবশ্য বাপ বা মায়ের থাকিবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, অনেকে ছোট ছেলে বা মেয়ের জিনিস নিয়া নিজে ব্যবহার করে বা এক ছেলের জিনিস অন্য ছেলেকে দেয়। এরূপ করা মোটেই দুরুস্ত নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** ছোট ছেলেমেয়ে নিজের জিনিস নিজের হাতে দান করিলে তাহা নেওয়া জায়েয নহে । ইহা মা-বাপেরও অধিকার নাই যে, ছোট ছেলেমেয়ের জিনিস অন্য কাহাকেও দান করিবে বা নিজেরা ব্যবহার করিবে। অবশ্য মা-বাপ যদি এত গরীব হয় যে, তাহাদের আর অন্য উপায় নাই, তবে তাহারা ছোট ছেলেমেয়ের জিনিস ব্যবহার করিতে পারে বটে।

৮। **মাসআলা ঃ** ছোট ছেলেমেয়ের জিনিস কাহাকেও করয দেওয়া জায়েয নাই। খোদ মা-বাপের জন্যও করয নেওয়া ছহীহ্ হইবে না।

দিয়া ফিরাইয়া নেওয়ার বিবরণ

১। **মাসআলা ঃ** একজনকে একটি জিনিস দিয়া আবার ফিরাইয়া নেওয়া ভারী অন্যায়, ভারী লজ্জার কথা এবং বড় গোনাহ্। অবশ্য যদি কেহ ফিরাইয়া নেয় এবং যাহাকে দান করা হইয়াছিল সেও খুশী হইয়া ফিরাইয়া দেয়, তবে সে ঐ জিনিসের মালিক হইয়া যাইবে। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় ফিরাইয়া নেওয়ারই অধিকার থাকে না। যেমন, যদি কেহ একটি বকরী কাহাকেও দিয়া থাকে এবং সে উহাকে খাওয়াইয়া চরাইয়া খুব মোটা তাজা করিয়াছে, এখন আর ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার নাই। যদি কেহ এক টুকরা জমি কাহাকেও দান করে এবং সে সেই জমিনে বাগিচা বানায় বা বাড়ী বানায়, তবে ঐ জমি আর ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকিবে না। যদি

কেহ কাহাকেও কাপড় দান করে এবং সেই কাপড় সেলাই করিয়া জামা বানায় বা সেই কাপড়ে রং দেয়, তবে আর ঐ কাপড় ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

২। **মাসআলা ঃ** কেহ কাহাকেও একটি বকরী দান করিল। তাহার ঐ বকরীর বাচ্চা হওয়ার পর দাতার খেয়াল চাপিল যে, বকরী সে ফেরত নিবে, তবে সে বকরী ফেরত নিতে পারবে; কিন্তু বাচ্চা নিতে পারিবে না (এবং যাবৎ বাচ্চার দুধ খাওয়া না ছুটিবে, তাবৎ বকরীও নিতে পারিবে না।)

৩। **মাসআলা ঃ** দান করার পর দাতা বা গ্রহীতার যে কেহ একজন মরিয়া গেলে দান করা মাল আর ফেরত লওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** দানের বদলে প্রতিদান হওয়ার পর দানের মাল ফেরত লওয়ার অধিকার থাকে না। আর যদি প্রতিদান বলিয়া না দেওয়া থাকে, তবে উভয়ে উভয়ের জিনিস ফিরাইয়া লইতে পারিবে।

৫। **মাসআলা ঃ** স্বামী তার স্ত্রীকে কোন জিনিস দান করিলে বা স্ত্রী তার স্বামীকে কোন জিনিস দান করিলে সে জিনিস ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে না। এইরূপ ভাগ্নে-ভাগ্নী, ভাতিজা-ভাতিজী, ভাই-ভগ্নি, মামা-খালা, চাচা-ফুফু ইত্যাদি যী-রাহম, মাহরামকে কোন জিনিস দান করিলে তাহা আর ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে না। আর যদি এরূপ হয় যে, আত্মীয়তা আছে কিন্তু বিবাহ হারাম নহে, যেমন চাচাত বোন, ফুফাত বোন ইত্যাদি; কিংবা বিবাহ হারাম কিন্তু বংশের দিক দিয়া আত্মীয়তা নাই, যেমন দুধ-ভাই, বোন, শ্বশুর, শাশুড়ী, দামাদ ইত্যাদি, তবে ইহাদের নিকট হইতে ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে।

৬। **মাসআলা ঃ** অবশ্য (উপরোক্তরূপ আত্মীয় ছাড়া) অপর কেহ হইলে তাহাকে দান করার পর তাহার নিকট হইতে ফেরত লওয়া গোনাহ্ বটে, কিন্তু ফেরত নিতে চাহিলে যদি সে খুশী হইয়া দিয়া দেয়, তবে সে জিনিসের মালিক হইয়া যাইবে; আর খুশী হইয়া না দিলে এবং জবরদস্তী ফেরত নিলে, সে ঐ জিনিসের মালিক হইবে না। কিন্তু কোর্টের বিচারে ফেরত পাইলে সে ঐ জিনিসের মালিক হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আখেরাতের ছওয়াবের নিয়তে কোন গরীবকে বা কোন তালেবে এলমকে কিছু দান করিলে উহা ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে না।

৮। **মাসআলা ঃ** কোন গরীবকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এক পয়সা দান করিতে গিয়া ভুলে যদি আধুলি তার হাতে চলিয়া যায়, তবে সে আধুলি ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার আর তাহার থাকে না।

কেরায়া এবং মজুরীর বিবরণ

(ঘর-বাড়ী গাড়ীঘোড়া প্রভৃতির উজরতকে সাধারণতঃ কেরায়া বা ভাড়া বলে; আর মানুষের উজরতকে সাধারণতঃ মজুরী বা পারিশ্রমিক বলে; আর একটু উপরের হইলে বেতন বলে। জমিনের উজরতের কারবারকে সাধারণতঃ ইজারা বলে। কিন্তু এইগুলির সবই হইতেছে পয়সার পরিবর্তে কোন জিনিসকে বা কাহাকেও খাটাইয়া নেওয়া। আরবী ভাষায় এই ধরনের সমস্ত কারবারকে "ইজারা" বলে।)

১। **মাসআলা ঃ** মাসিক কেরায়া ঠিক করিয়া আপনি একখানা ঘর কেরায়া করিলেন; বাড়ীওয়ালাও আপনাকে চাবি বুঝাইয়া দিল। এখন মাস অন্তর ধার্যকৃত কেরায়া দেওয়া আপনার উপর ওয়াজিব হইয়া গেল—চাই আপনি ঐ বাড়ীতে থাকেন বা না থাকেন, (এইরূপে বার্ষিক কেরায়া নগদ টাকা বা ধান বা পাট বা অন্য কোন জিনিস ঠিক করিয়া আপনি এক খন্ড জমি বার্ষিক কেরায়া নিলেন জমিওয়ালাও আপনাকে জমিতে দখল দিয়া দিল; এখন বৎসর অন্তে ধার্যকৃত কেরায়া দিয়া দেওয়া আপনার উপর ওয়াজিব হইয়া গেল—চাই আপনি চাষ করেন আর না করেন, ফসল হউক বা না হউক।)

২। **মাসআলা ঃ** আপনার নিকট দর্জি কাপড় সেলাই করিয়া আনিয়াছে, রংরেজ কাপড়ে রং দিয়া আনিয়াছে বা ধোপা কাপড় ধুইয়া আনিয়াছে—এ অবস্থায় তাহাদের পয়সা আগে দিয়া তারপর আপনার জিনিস নেওয়া উচিত; পয়সা না দিয়া জোর করিয়া মাল আপনি নিতে পারেন না; বরং পয়সা না পাওয়া পর্যন্ত তাহারা আপনার মাল আটকাইয়া রাখিতে পারে। এই অধিকার তাহাদের আইনত আছে। কিন্তু কোন মেহনতী মজদুর দ্বারা একটা বোঝা বহন করাইয়া আনিলে মজুরীর জন্য তাহার মাল আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কেননা, তাহাদের কাজের কারণে মালের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয় না। কিন্তু দরজী এবং রংরেজের কাজে পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়াছে। (তাহাদের গায়ের ঘাম শুকাইবার আগে ধার্যকৃত ন্যায্য মজুরী তাহাদিগকে দিয়া দিতে হইবে।)

৩। **মাসআলা ঃ** যদি এইসব কাজে মজুরী ঠিক করিবার সময়ে এইরূপ শর্ত করে যে, তুমিই সেলাই করিবে, তুমিই রং করিবে, তোমার নিজেরই এই কাজ করিতে হইবে, তবে অন্যের দ্বারা উহা করান জায়েয হইবে না, নিজেরই করিতে হইবে। আর যদি তদ্রূপ শর্ত না করে, তবে অন্যের দ্বারাও করাইতে পারিবে।

ফাছেদ ইজারার বর্ণনা

১। **মাসআলা ঃ** যদি বাড়ীভাড়া নেওয়ার কালে সময় নির্দিষ্ট না করে যে, কত দিনের জন্য এই কেরায়া নিয়াছে কিম্বা ভাড়া নির্ধারিত না করিয়াই লইয়াছে, কিংবা এই শর্ত করিয়াছে যে, যাহাকিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে, উহাও আমি (ভাড়াটিয়া) ঠিক করিয়া লইব, কিংবা এই ওয়াদায় বাড়ীভাড়া নিয়াছে যে, বাড়ী মেরামত করাইয়া নিবে এবং ইহাই বাড়ী ভাড়াস্বরূপ হইবে। এই ধরনের কেরায়া ফাছেদ। আর যদি এরূপ বলে যে, তুমি এই বাড়ীতে থাক এবং বাড়ী মেরামত করিও ভাড়া লাগিবে না, তবে ইহা আ'রিয়াত হইবে এবং জায়েয হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** কেহ এই বলিয়া ভাড়া লইল যে, দুই টাকা মাসিক ভাড়া দিব, তবে শুধু এক মাসের জন্যই কেরায়া ছহীহ্ হইল। মাসের শেষে বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াকে উঠাইয়া দিতে পারে। আবার যদি দ্বিতীয় মাসে ভাড়াটিয়া রহিয়া গেল, তবে আবার এক মাসের জন্য কেরায়া ছহীহ্ হইয়া গেল, এমনিভাবে প্রত্যেক মাসে নূতন কেরায়া হইতে থাকিবে। অবশ্য যদি ভাড়া লইবার সময় ইহাও বলে যে, চার মাস কিংবা ছয়মাস থাকিব, তবে যত দিনের কথা বলিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত ভাড়া লওয়া ছহীহ্ হইবে। ঐ সময়ের পূর্বে বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াকে উঠাইতে পারিবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** কেহ পিষাইবার জন্য গম দিয়া বলিল, ইহার মধ্যে হইতে এক পোয়া আন্দাজ মজুরী হিসাবে নিবেন। কিংবা ক্ষেতের ফসল কাটাইয়া বলিল, ইহা হইতে এই পরিমাণ ফসল মজুরী হিসাবে নিবেন, এসমস্ত (কেরায়া) ফাছেদ।

৪। **মাসআলা ঃ** ফাছেদ ইজারার হুকুম এই যে, যাহাকিছু নির্ধারিত হইয়াছে তাহা দেওয়া যাইবে না; বরং এতটুকু কাজের জন্য যে পরিমাণ মজুরীর দস্তুর আছে, কিংবা এমন ঘরের ভাড়া যে পরিমাণ দস্তুর আছে, তাহা দেওয়া হইবে। কিন্তু যদি দস্তুর পরিমাণ ভাড়া বা মজুরী বেশী হয় অথচ ঠিক হইয়াছিল কম, তবে দস্তুর পরিমাণ দেওয়া হইবে না; বরং যাহা ঠিক হইয়াছিল তাহাই পাইবে। মোট কথা, যাহা কম হইবে তাহাই পাইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** গান, বাদ্য, নাচ, বানর নাচান ইত্যাদি বেহুদা কাজের ইজারা ছহীহ্ নহে, একেবারেই বাতেল। এজন্য কিছুই দেওয়া যাইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** কোন হাফেযকে মজুর রাখিল যে, এতদিন পর্যন্ত অমুকের কবরে কোরআন পড়িতে থাক এবং ছওয়াব বখশাইতে থাক। ইহা ছহীহ্ নহে, বাতেল। পড়নেওয়ালাও ছওয়াব পাইবে না এবং মৃত ব্যক্তিও পাইবে না এবং সে কোন বেতন পাইবার হকদার হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** পড়ার জন্য কোন কিতাব ভাড়া লইল, ইহাও ছহীহ্ নহে; বরং বাতেল।

৮। **মাসআলা ঃ** ছাগী, গাভী, মহিষ ডাকিলে ষাঁড়, পাঁঠা দেখাইয়া তার মজুরী লওয়া বিলকুল হারাম।

৯। **মাসআলা ঃ** ছাগী, গাভী, মহিষের দুধ পান করিবার জন্য ভাড়া লওয়া দুরুস্ত নাই।

১০। **মাসআলা ঃ** জানোয়ার আধাআধি ভাগে দেওয়া দুরুস্ত নাই, অর্থাৎ এরূপ বলা যে, মুরগী, বকরী লইয়া যাও এবং ভালমত লালন-পালন কর। যত বাচ্ছা হইবে, অর্ধেক তোমার অর্ধেক আমার। ইহা দুরুস্ত নাই।

১১। **মাসআলা ঃ** বাড়ী সাজাইবার জন্য ঝাড় ফানুস ইত্যাদি ভাড়া লওয়া জায়েয নাই। যদি আনে, দাতা ভাড়া পাইবে না; অবশ্য যদি ঝাড় ফানুস আলো জ্বালাইবার জন্য আনে, তবে দুরুস্ত আছে।

১২। **মাসআলা ঃ** কোন ঘোড়া-গাড়ী বা গরুগাড়ী ভাড়া লইল, তবে সাধারণত প্রচলিত প্রথার চেয়ে বেশী বোঝা চাপান দুরুস্ত নাই, এমনিভাবে পাল্কী বহনকারীদের অনুমতি ব্যতীত উহাতে দুই দুইজন বসা দুরুস্ত নাই।

১৩। **মাসআলা ঃ** কাহারও কোন জিনিস হারাইয়া (খোয়া) গেল, সে বলিল, যে হারান জিনিসের সন্ধান বলিয়া দিবে, তাহাকে এক পয়সা দিব। ইহাতে যদি কেহ বলিয়া দেয়, তবুও পয়সা পাইবে না। কেননা এই ইজারা ছহীহ্ হয় নাই। আর যদি কোন নির্দিষ্ট লোককে বলে যে, তুমি যদি বলিতে পার, তবে পয়সা দিব, তবে যদি সে ঐ স্থানে বসিয়াই কিংবা তথায় দাঁড়াইয়া বলিয়া দেয়, তবে কিছু পাইবে না। আর যদি কিছু চলাফেরা করিয়া বলিয়া দেয়, তবে পয়সা আধ পয়সা যাহা ওয়াদা ছিল তাহা পাইবে।

ক্ষতিপূরণ লইবার বর্ণনা

১। **মাসআলা ঃ** পেশাগত রংকার, ধোপা, দর্জি প্রভৃতি দ্বারা কোন কাজ করাইবার জন্য কোন জিনিস দিলে তাহা তাহাদের নিকট আমানত হইবে। যদি চুরি হইয়া যায় বা অনিচ্ছাকৃতভাবে

অন্য কোন রকমে নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাদের থেকে ভর্তুক লওয়া দুরুস্ত নাই; অবশ্য যদি ধোপার আছাড়ের কারণে কাপড় ফাটিয়া যায় অথবা দামী রেশমী কাপড়কে ভাটী দেওয়ার কারণে উহা খারাপ হইয়া যায়, তবে উহার ভর্তুক লওয়া জায়েয আছে। এমনিভাবে যে কাপড় বদল করিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয আছে। আর কাপড় খোয়া গেলে যদি বলে, জানি না কিভাবে গেল, কোথায় গেল, তবে উহার ভর্তুক লওয়া জায়েয আছে। আর যদি বলে, আমার বাড়ী চুরি হইয়াছে, উহাতে খোয়া গিয়াছে, তবে ভর্তুক লওয়া দুরুস্ত নাই।

২। **মাসআলা ঃ** কোন কুলী মুজুরকে ঘি, তেল ইত্যাদি বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে বলিল। কুলীর কাছ হইতে উহা রাস্তায় পড়িয়া গেল, তবে উহার ভর্তুক লওয়া জায়েয আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** আর যাহারা পেশাগতভাবে মজুর নহে; বরং নির্দিষ্টভাবে শুধু আপনার কাজের জন্য যেমন বাড়ীর চাকর-বাকর বা ঐ মজুর যাহাকে এক বা দুই-দিনের জন্য রাখিয়াছেন, তাহার হাতে যাহাকিছু ক্ষতি হইবে, উহার ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয নহে। অবশ্য সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করে, তবে ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয আছে।

৪। **মাসআলা ঃ** যে চাকর শিশুকে খাওয়ানের কাজে নিযুক্ত আছে তাহার বে-খেয়ালিতে শিশুর অলংকার কিংবা অন্য কিছু হারাইয়া গেলে, তাহার ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয নহে।

ইজারা (কেরায়া) ভাঙ্গিয়া দেওয়ার বর্ণনা

১। **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি বাড়ী ভাড়া নিয়াছে কিন্তু বেশী রকম পানি পড়ে কিংবা কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে অথবা অন্য কোন ত্রুটি প্রকাশ পাইল যাহার কারণে এখন বসবাস করা মুশকিল, তবে কেরায়া তুড়িয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। আর যদি একেবারেই পড়িয়া যায়, তবে কেরায়া নিজে নিজেই ভাঙ্গিয়া গেল আপনার তুড়িয়া দেওয়া এবং বাড়িওয়ালার অনুমতি দরকার নাই।

২। **মাসআলা ঃ** কেরায়া গ্রহীতা এবং দাতা উভয়ের মধ্যে যদি কেহ মরিয়া যায়, তবে কেরায়া টুটিয়া যাইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি এমন কোন ওযর সৃষ্টি হয়, যে কারণে কেরায়া তুড়িয়া দেওয়ার আবশ্যক হয়, তবে এই অসুবিধার সময় কেরায়া তুড়িয়া দেওয়া জায়েয আছে। যেমন, কোথাও যাওয়ার জন্য গাড়ী ভাড়া করিল, অতঃপর মত বদলিয়া গেল, যাওয়ার ইচ্ছা রহিল না, তখন কেরায়া তুড়িয়া দেওয়া ছহীহ্ হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কেরায়া ঠিক করিয়া বায়না দেওয়ার যে প্রথা আছে যদি যাওয়া হয় তবে তাহাকে সম্পূর্ণ ভাড়া দেয় এবং ঐ বায়না ভাড়া হইতে কাটিয়া লয়, আর না গেলে ঐ বায়না ফেরত দেয় না, ইহা দুরুস্ত নহে বরং উহা ফেরত দেওয়া চাই।

বিনানুমতিতে পরের জিনিস লওয়া

(বিনা এজাযতে কাহারও কোন জিনিস নেওয়া অন্যায়। অনেকে চাচার বা ভাইর জিনিস আপন লোকের জিনিস বলিয়া বিনা এজাযতে গোপনে বা জোর করিয়া নেয়—ইহা অতি বড় গোনাহ্। যার জিনিস সে যদি খুশী হইয়া না দেয়, তবে সে যতই আপন লোক হউক না কেন, সে জিনিস নেওয়া হারাম হইবে এবং বড় গোনাহ্ হইবে। যতই সামান্য জিনিস হউক না কেন,

মালিকের বিনা খুশীতে গোপনে নিলে চুরির গোনাহ্ হইবে ও প্রকাশ্যে জোরজবরদস্তী করিয়া নিলে যুলুমের গোনাহ্ হইবে। হাদীস শরীফে আছেঃ لَايَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِهٖ

'কোন মুসলমানের কোন মাল অন্য কাহারও হালাল হইবে না যে পর্যন্ত না সে আন্তরিক খুশীতে এজাযত দিবে।' —মেশ্‌কাত—অনুবাদক)

১। **মাসআলাঃ** কাহারও কোন জিনিস জবরদস্তী লওয়া, কিম্বা অনুপস্থিতি বিনা অনুমতিতে লওয়া বড় গোনাহ্। কোন কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামী কিম্বা আত্মীয়ের জিনিস বিনানুমতিতে লয়, ইহাও দুরুস্ত নহে। যে জিনিস বিনানুমতিতে লইয়াছে, যদি সেই জিনিস এখনও মওজুদ থাকে, তবে অবিকল সেই বস্তু ফেরত দিয়া দিবে। আর যদি খরচ হইয়া গিয়া থাকে, তবে (তাহার হুকুম এই যে—যদি সে বস্তু এ ধরনের ছিল যে,) বাজারে তাহার অনুরূপ বস্তু পাওয়া গেলে যেমন, ঘি, তেল, টাকা-পয়সা, তবে যে ধরনের বস্তু লইয়াছে—ঐ রকমই আনাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি এমন বস্তু নিয়া নষ্ট করিয়াছে যে) তার নমুনা পাওয়া মুশ্‌কিল হয়। যেমন, মুরগী, বকরী, পেয়ারা, কমলা, নাশপাতি—ইত্যাদি, তবে তার দাম দিতে হইবে।

২। **মাসআলাঃ** চার পাইয়ার (চৌকির) একটা পায়া ভাঙ্গিয়া গেল, কিম্বা কার্নিশ বা কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেল, কিম্বা অন্য কোন বস্তু নিয়াছিল উহা নষ্ট হইয়া গেল, তবে নষ্ট হওয়াতে যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা দিতে হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** যদি কেহ মালিকের বিনানুমতিতে পরের টাকা দিয়া ব্যবসা করে, তবে আসল টাকা মালিককে ফেরত দিতে হইবে এবং লাভের টাকা গরীব দুঃখীদিগকে খয়রাত করিয়া দিতে হইবে, নিজে নিতে পারিবে না।

৪। **মাসআলাঃ** কেহ কাহারও একটি চাদর নিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; যদি ছেঁড়া অল্প হয়, তবে ত তৎপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, আর যদি অনেক ছেঁড়া হয় এবং এমন হয় যে, এখন আর চাদররূপে ব্যবহার করা যাইবে না, তবে ঐ ছেঁড়া চাদর তাহাকে দিয়া তাহার নিকট হইতে কাপড়ের সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করিতে হইবে।

৫। **মাসআলাঃ** যদি কেহ মালিকের বিনানুমতিতে পাথর নিয়া নিজের আংটিতে লাগাইয়া থাকে, তবে পাথরের দাম দিতে হইবে। আংটি ভাংগিয়া পাথর খুলিবার দরকার হইবে না।

৬। **মাসআলাঃ** যদি কেহ অন্যের কাপড় (মালিকের বিনানুমতিতে) রং করাইয়া থাকে, তবে কাপড় ফেরত লইবার সময় তাহার রঙের দাম দিতে হইবে; অথবা ঐ কাপড় তাহাকে দিয়া তাহার নিকট হইতে সাদা কাপড়ের দাম নিতে হইবে।

৭। **মাসআলা** ঃ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর যদি আসল জিনিস পাওয়া যায়, তবে দেখিতে হইবে, যদি মালিকের কথা অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব নহে। যদি মালিকের কথার খেলাফ নিজের কথা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিয়া থাকে, তবে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিয়া জিনিসটি তাহাকে দিতে হইবে।

৮। **মাসআলাঃ** পরের গাই বা বকরী যদি কাহারও বাড়ীতে আসিয়া পড়ে, তবে তার দুধ দোহন করা হারাম। যদি দুধ দুহিয়া বা বেচিয়া থাকে, তবে তার মূল্য দেওয়া ওয়াজিব।

৯। **মাসআলাঃ** সুই, সূতা, কাপড়ের টুকরা, পান সুপারী, খয়ের তামাক ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসও বিনা অনুমতিতে নিয়া থাকিলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। দুনিয়াতে না দিলে আখেরাতে দিতে হইবে, সুতরাং দুনিয়াতেই তাহা পরিশোধ করিবে বা মাফ চাহিয়া নিবে।

১০। মাসআলা ঃ স্বামী নিজের ব্যবহারের জন্য কোন কাপড় আনিল। কাটিবার সময় স্ত্রী উহা হইতে কিছু বাঁচাইয়া চুরি করিয়া রাখিল, স্বামীকে বলিল না। ইহাও জায়েয নাই। যাহাকিছু নিবে, বলিয়া নিবে। অনুমতি না দিলে লইবে না।

শরীকী কারবার

(শরীকী কারবারের মধ্যে বড় বরকত। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ فَاِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ○

"অর্থাৎ, দুইজনে মিলিয়া শরীক হইয়া যদি কোন শরীকী কারবার করে, তবে আমি নিজে আমার রহ্মত ও বরকত লইয়া তাহাদের সঙ্গে থাকি। যখন তাহারা আমানতে খেয়ানত করে, তখন আমি আমার রহ্মত ও বরকত লইয়া তাহাদের কারবার হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাই।"

দেখা গেল এবং প্রমাণ হইল যে, শরীকী কারবার অর্থাৎ লিমিটেড কোম্পানির কারবার বড়ই বরকতের কারবার—চাই সে কারবার কৃষির মধ্যে হউক বা শিল্পের মধ্যে হউক বা অন্য যে কোন বাণিজ্যের মধ্যে হউক। কিন্তু বরকতের জন্য শর্ত এই যে, কোন শরীকের দ্বারা যেন কোনরূপ খেয়ানত না হয়। খেয়ানত হয় দুই প্রকারে—(১) কাম চুরি করিলে এবং (২) পয়সা চুরি করিলে। অর্থাৎ, শরীকদের মধ্যে যদি একজনেরও নিয়ত, দেল খারাপ হইয়া যায় এবং এইরূপ ভাবে যে, আমি একটু কাজ কম করি ও' খাটিয়া মরুক বা একজনে যদি অন্যের অগোচরে একটি পয়সাও সরাইয়া নেয় বা গোপনে তহ্বীল তছরুফ করে, তবে সে কারবারে আর বরকত এবং আল্লাহ্র খাছ রহ্মত থাকিবে না। —অনুবাদ)

১। মাসআলা ঃ একজন লোক মরিয়া গেল এবং বাড়ী-ঘর কাপড়-চোপড়, লেপ-তোষক, কাঁথা-বালিশ, থাল-বাসন, ঘটি-কলস, টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি ইত্যাদি সম্পত্তি রাখিয়া গেল এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কয়েকজন ছোট-বড়, দুর্বল-সবল ওয়ারিস রাখিয়া গেল। এমন সব মাল সকল শরীকদের শরীকী অংশ হিসাবে হইয়া যাইবে। এখন আর যার যার অংশ পৃথক পৃথক ভাগ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মালের কিছুমাত্র জিনিস সব শরীকদের এজাযত ব্যতিরেকে ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। যদি কেহ সকলের বিনা এজাযতে ব্যবহার করে, তবে সে গোনাহ্গার হইবে।

২। মাসআলা ঃ (ত্যাজ্য সম্পত্তির কয়েকজন ওয়ারিস হইলে তাহারা যেমন ভাগ করার আগে একে অন্যের শরীক হয় এবং একজনের বিনা অনুমতিতে অন্যজনে সে জিনিস এস্তেমাল করিতে পারে না। ঐরূপে) দুই তিনজনে মিলিয়া যদি কোন একটা জিনিস খরিদ করে, তবে তাহারাও ঐ জিনিসে একে অন্যের শরীক হয়, কজেই এক শরীকের বিনা অনুমতিতে অন্য শরীক জিনিস এস্তেমাল বা বিক্রয় করিতে পারে না। (এইরূপ শরীক হওয়াকে 'শেরকাতে মিলক' বলে। আর এক রকম শেরকাত আছে, তাহার নাম "শেরকাতে আকদ", এ সম্পর্কে সামনে বলা হইবে।)

৩। মাসআলা ঃ দুইজন লোক এক সঙ্গে শরীক হইয়া আপন পয়সা মিলাইয়া কোন জিনিস কিনিলে সেই জিনিস ভাগ করার সময় উভয়ের সামনে থাকিতে হইবে। একজনে নিজের মতে অন্য জনের অসাক্ষাতে ভাগ করিয়া নিজে নিয়া থাকিলে শক্ত গোনাহ্ হইবে। অবশ্য যদি এমন জিনিস ক্রয় করে, যার মধ্যে ভাল-মন্দ বেশ-কম নাই সবই সমান, তবে সে জিনিস যদি আমানতদারীর সহিত একজনে অন্যজনের অসাক্ষাতে ভাগ করে, তবে তাহা করিতে পারিবে বটে,

কিন্তু ভাগ করার পর তাহাকে দেওয়ার পূর্বে যদি চুরি বা খেয়ানত হয়, তবে এই ক্ষতি উভয়েরই হইবে এবং ভাগ করনেওয়ালার সংগে উভয়ে শরীক হইয়া ভাগ করিয়া নিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** দুইজন লোক ১০০, ১০০ শত টাকা মিলাইয়া মাল কিনিয়া তেজারত (ব্যবসা) করিতে চাহিতেছে এবং পরস্পর চুক্তি করিতেছে যে, আমরা শরীকী কারবার করিব; যাহা কিছু মুনাফা হইবে আমরা সমান ভাগ করিয়া নিব। এরূপ করা শরীঅতে দুরুস্ত আছে এবং এ সম্বন্ধে শরীঅতের কিছু বিধানও আছে। মূলধন সমান হওয়া সত্ত্বেও যদি মুনাফার মধ্যে বেশ-কম ভাগ রাখে, তবে তাহাও জায়েয আছে, এটা তাহাদের এখতিয়ার। আর যদি মূলধন বেশ-কম হওয়া সত্ত্বেও মুনাফার মধ্যে সমান সমান অংশ রাখে, তবে সেটাও তাহাদের দুইজনের এখতিয়ার। (কিন্তু প্রথমেই সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া লইতে হইবে, গোলেমালে কোন কথা বলা যাইবে না।)

৫। **মাসআলা ঃ** শরীক হইয়া কারবার করার চুক্তি ও কথাবার্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে এবং দুই জনের টাকা-পয়সা একত্র করিয়া মিশাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন মাল কেনা হয় নাই। এমতাবস্থায় হয়ত খোদা নাখাস্তা, সব টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে অথবা টাকা-পয়সা মিশান হয় নাই, এর মধ্যে একজনের টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থা হইলে শরীকী কারবারের যে চুক্তি হইয়াছিল সে চুক্তি শেষ হইয়া যাইবে। পুনরায় শরীকী কারবার করিতে হইলে পুনরায় চুক্তি ও কথাবার্তা ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** দুইজনে শরীকী কারবার করার এইরূপ চুক্তি করিল যে, আমরা দুইজনে সমান সমান মূলধন দিয়া কারবার করিব, আল্লাহ্ কিছু মুনাফা দিলে সমান ভাগ করিয়া নিব (এইরূপ চুক্তি করার পর একজনে তার টাকা দিয়া কিছু মাল খরিদ করিয়াছে, কিন্তু ঘটনাক্রমে অন্যজনের সব টাকা চুরি হইয়া গেল; এমতাবস্থায় যে মাল খরিদ করা হইয়াছে উহাতে দুইজনেই শরীক থাকিবে। যার টাকা দিয়া মাল খরিদ করা হইয়াছে সে অন্যজনের কাছ থেকে মালের অর্ধেক টাকা নিতে পারিবে (এবং মালে লাভ লোকসান হইলে তাহা দুই জনেরই হইবে।)

৭। **মাসআলা ঃ** দুইজনে শরীকী কারবারের চুক্তি করার সময় যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, যাহাকিছু লাভ হইবে তাহা হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা (দশ বিশ, পঞ্চশ ইত্যাদি) আমার আর বাকী সবই তোমার; এইরূপ শর্ত করিলে তাহা দুরুস্ত হইবে না। (লাভ অংশে অংশে ঠিক করিতে হইবে—তা চাই সমান অংশ হউক বা বেশ-কম হউক। যেমন,অর্ধেক-অর্ধেক, সিকি-বার আনা, দশ আনা-ছয় আনা ইত্যাদি।)

৮। **মাসআলা ঃ** শরীকী কারবারে মাল কেনার পর যদি মাল চুরি হয়, তবে তাহা উভয়েরই যাইবে, একজনের যাইবে না। যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, মুনাফা (লাভ) হইলে দুইজনের, কিন্তু লোকসান হইলে সেটা সবই আমার, এইরূপ শর্ত করা দুরুস্ত নহে।

৯। **মাসআলা ঃ** শরীকী কারবার যদি কোন শর্তের কারণে ফাছেদ বা না-দুরুস্ত সাব্যস্ত হয় তবে মুনাফা (লাভ) ভাগ করার সময় চুক্তির কথাবার্তার (কওল ও করার) প্রতি দেখা যাইবে না; বরং মূলধনের প্রতি দেখিয়া মুনাফা ভাগ করিতে হইবে; যার যে পরিমাণ পুঁজি সে সেই পরিমাণ লাভের অংশ পাইবে। চুক্তির সময়কার' কওল ও করার ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্য হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীকী কারবার ছহীহ্ হইবে, কোন শর্তের কারণে ফাছেদ না হইবে।

১০। মাসআলা ঃ যদি দুইজন দর্জি এইরূপ শরীকী কারবারের চুক্তি করে যে, আমরা দুইজনে এক সঙ্গে কারার করিব, যা কিছু সেলাইর কাজ আসিবে দুইজনেই করিব এবং উহার মজুরী দুইজনে ভাগ করিয়া নিব। এরূপ চুক্তিতে শরীকী কারবার দুরুস্ত আছে। (যদি কাজ সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও পয়সা কম-বেশ নেওয়ার চুক্তি করিয়া থাকে বা কাজে কিছু বেশ-কম সত্ত্বেও পয়সা সমান সমান নেওয়ার চুক্তি করিয়া থাকে, তবে সেরূপ চুক্তি করাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু এরূপ চুক্তি করা দুরুস্ত নাই যে, যা কিছু পাওয়া যাইবে তার থেকে পাঁচ টাকা আমার আর বাকী সব তোমার।

১১। মাসআলা ঃ শরীকী কারবারের চুক্তিতে যে কয়জন আবদ্ধ হইবে তাহাদের প্রত্যেককেই সকল কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। একজনে কাজ নিলে অন্যজনে বলিতে পারিবে না যে, 'তুমি কাজ নিয়াছ, তুমিই কাজ কর, আমি করিব না, বরং সকলের উপরই ঐ কাজ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। (সময় মত নিয়ম মত সকলেরই কাজ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে।)

১২। মাসআলা ঃ শরীকী কারবারের দোকানে একজনে কাপড় সেলাই করিতে দিল; কাপড়ওয়ালা যখন কাপড় নিতে আসিবে, তখন শরীকদের যেই উপস্থিত থাকুক না কেন, তাহার নিকটই সে কাপড় চাহিতে পারিবে। উপস্থিত ব্যক্তি এরূপ বলিতে পারিবে না যে, 'আমি ত আপনার কাপড় রাখি নাই, যে রাখিয়াছে তাহার কাছে চাহিবেন।' এইরূপ বলা একদম জায়েয হইবে না। শরীকদের মধ্যে যাহার কাছেই চাওয়া হউক সেই দিতে বাধ্য থাকিবে যদিও সে নিজে কাপড় না রাখিয়া থাকে।

১৩। মাসআলা ঃ ঐ কাপড়ওয়ালার কাছ থেকে পয়সা গ্রহণ করার অধিকারও শরীকদের মধ্যে সকলেরই আছে এবং ইহাদের যাহার কাছে দিবে কাপড়ওয়ালা দেনামুক্ত হইয়া যাইবে। কাপড়ওয়ালাও ইহা বলিতে পারিবে না যে, যাহাকে কাপড় দিয়াছিলাম, পয়সা তাহাকে দিব। (আর যাহার কাছে কাপড় দেওয়া হইয়াছিল সেও একথা বলিতে পারিবে না যে, পয়সা আমারই কাছে দিতে হইবে, অন্য শরীকদের কাছে দিতে পারিবে না।)

১৪। মাসআলা ঃ দুইজনে যদি এইরূপ চুক্তি করে যে, চল, দুইজনে শরীকীভাবে নদী বা বিল হইতে মাছ ধরিয়া আনি অথবা জঙ্গল বা মাঠ হইতে লাকড়ী বা নাড়া (খড়) যোগাড় করিয়া আনি, তবে যেহেতু বিলের বা নদীর মাছ সকলের জন্য মোবাহ, সেই হেতু যে যেইটা ধরিবে সেই সেইটার মালিক হইবে। আর জঙ্গল বা মাঠের লাকড়ী বা নাড়া যে যাহা সংগ্রহ করিবে, সে তাহার মালিক হইবে। এইজন্য এইরূপ মোবাহ জিনিসের মধ্যে শরীকী কারবারের কোন অর্থ হয় না। (কিন্তু যদি চুক্তি করিয়া এইরূপ কাজ করে এবং কাঠ বা লাকড়ী একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখে, তবে যে হিসাবে চুক্তি করিয়াছে সেই হিসাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।)

১৫। মাসআলা ঃ একজন অপর জনকে বলিল, আমার ডিমগুলি তোমার মুরগীর নীচে (তাও দিবার জন্য) রাখ, যে পরিমাণ বাচ্চা ফুটিবে আমরা উভয়ে আধাআধি ভাগ করিয়া লইব। ইহা দুরুস্ত নাই।

শরীকী জিনিস ভাগ করিবার বর্ণনা

১। মাসআলা ঃ দুইজনে মিলিয়া বাজার হইতে গেঁহু আনাইল। এখন ভাগ করার সময় উভয়ের উপস্থিতি দরকার নাই। দ্বিতীয় অংশীদার উপস্থিত না থাকিলে তবু ঠিক ঠিক মাপিয়া

উহার অংশ পৃথক করিয়া নিজের অংশ লওয়া দুরুস্ত আছে। যখন নিজের অংশ পৃথক করিয়া লইবে তখন খাও পান কর, কাহাকেও দান কর, যা ইচ্ছা কর সব জায়েয। এরূপে ঘি, তৈল, ডিম ইত্যাদিরও এই হুকুম। মোটকথা, যে বস্তু এরূপ যে উহাতে কিছু বেশ-কম হয় না; যেমন ডিম, সব ডিম সমান হয় কিম্বা গেঁহু দুই ভাগ করা হইল এই ভাগ ঐ ভাগ একই রকম, উভয় অংশ সমান। এ সকল বস্তুর শুধু এই হুকুম যে, দ্বিতীয় জন উপস্থিত না থাকিলেও অংশ ভাগ করিয়া লওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু দ্বিতীয় অংশীদার নিজের অংশ গ্রহণ করে নাই, অথচ তাহার অংশ নষ্ট হইয়া গেল, তবে ঐ ক্ষতি উভয়েরই হইবে, যেমন শরীকী কারবারে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু যেসমস্ত জিনিসে বেশ কম হয়, যেমন পেয়ারা, কমলা ইত্যাদি, তবে উভয় অংশীদার উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অংশ ভাগ করিয়া লওয়া দুরুস্ত নহে।

২। **মাসআলা ঃ** দুই জনে মিলিয়া আম, পেয়ারা ইত্যাদি আনাইল এবং একজন কোথাও চলিয়া গেল এখন আর উহা হইতে খাওয়া দুরুস্ত নাই। যখন সে আসিবে তাহার সম্মুখে নিজের ভাগ পৃথক করিয়া লইবে নচেৎ শক্ত গোনাহ্ হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** দুই জনে মিলিয়া বুট ভাজাইল। এখন শুধু অনুমান করিয়া ভাগ দুরুস্ত নাই; বরং খুব ভাল ভাবে মাপিয়া সমান সমান করিয়া লওয়া চাই; কোন অংশে বেশী হইলে সুদ হইবে।

বন্ধক রাখার বিবরণ

১। **মাসআলা ঃ** তুমি কাহারও নিকট হইতে ১০ টাকা করয লইয়াছ এবং বিশ্বাসের জন্য নিজের কোন জিনিস তাহার কাছে রাখিয়াছ; যখন টাকা দিব, তখন আমার জিনিস লইয়া যাইব। ইহা জায়েয, ইহাকে বন্ধক বা রেহেন বলে। কিন্তু সুদ দেওয়া কোন প্রকারেই দুরুস্ত নাই। যেমন আজকাল মহাজনেরা সুদ লইয়া বন্ধক রাখে ইহা দুরুস্ত নাই। সুদ লওয়া এবং দেওয়া উভয় হারাম।

২। **মাসআলা ঃ** কোন জিনিস বন্ধক দিলে যাবৎ করয পরিশোধ না করিবে তাবৎ সে জিনিস ফিরাইয়া লওয়ার বা দখল লওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** কোন জিনিস বন্ধক রাখিলে সেই জিনিস বন্ধক গ্রহীতা আদৌ কোনরূপ ব্যবহার করিলে তাহা না-জায়েয হইবে। বাগান বন্ধক রাখিলে উহার ফল খাওয়া, জমি বন্ধক রাখিলে তাহার ফসল খাওয়া বা টাকা খাওয়া, ঘর বন্ধক রাখিলে উহাতে বাস করা। (জেওর বন্ধক রাখিলে তাহা ব্যবহার করা, থালা বাটি বন্ধক রাখিলে তাহা ব্যবহার করা)—সবই না-জায়েয (এবং সবই সুদ।)

৪। **মাসআলা ঃ** যদি গরু, ঘোড়া বা বকরী বন্ধক রাখে, তবে (তার খোরাক ইত্যাদির খরচ মালিকের জিম্মায়। রেহেন রাখনেওয়ালা গাই বা বকরীর দুধ খাইতে পারিবে না। বলদ দ্বারা হাল চাষ করিতে পারিবে না, ঘোড়ায় ছওয়ার হইতে পারিবে না।) গাই, বকরীর দুধ, বাছুর সবই তার কাছে আমানত থাকিবে। যখন করযদার করযের টাকা পরিশোধ করিবে, তখন দুধের টাকা ও বাছুর সবই তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। অবশ্য যাহাকিছু খরচ হইয়াছে সে খরচের টাকা কাটিয়া রাখিতে পারিবে। (খোরাকী খরচ ও দুধের দাম যদি সমান হয় এবং ঘোড়ার ঘাস প্রভৃতি খরচ যদি ঘোড়ার কেরায়ার সমান হয় বা বলদের হালের দাম এবং বলদের খোরাকীর খরচ সমান

হয়, তবে অন্যের দ্বারা সালিসী বিচার করাইয়া খোরাকীর খরচ পরিমাণ ঘোড়া বা বলদ খাটাইয়া নিতে পারিবে এবং গাই বকরীর দুধও সেই পরিমাণ নিতে পারিবে।)

৫। **মাসআলা ঃ** করযের কতক টাকা পরিশোধ করার পর বন্ধকী জিনিস ছাড়াইয়া নেওয়ার অধিকার হয় না। করযের টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিয়া দিলে বন্ধকী জিনিস ফেরত পাইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** করযের টাকার পরিমাণ এবং বন্ধকী জিনিসের মূল্যের পরিমাণ যদি সমান সমান হয় অথবা বন্ধকী জিনিসের মূল্যের পরিমাণ করযের টাকার চেয়ে বেশী হয় এবং বন্ধকী জিনিস কোন রকমে খোয়া যায়, তবে করযের টাকা শোধ হইয়া যাইবে। করয দেনেওয়ালা আর তার করযের টাকা চাহিতে পারিবে না এবং জিনিসওয়ালাও তার জিনিস চাহিতে পারিবে না। আর যদি বন্ধকী জিনিসের মূল্য করযের টাকার চেয়ে কম হয়, তবে জিনিসের যে মূল্যে ছিল সেই পরিমাণ করয পরিশোধ হইবে এবং বাকী টাকা দিয়া দিতে হইবে।

জমি বর্গা দেওয়া,পত্তন দেওয়া প্রভৃতি

১। **মাসআলা ঃ** অংশ হিসাবে জমি বর্গা দিলে তাহা জায়েয আছে। এখানে ৪টি জিনিস আছে ঃ—(১) জমি, (২) লাঙ্গল-গরু, (৩) বীজ এবং (৪) মেহ্নত। জমি একজনের, বাকী তিনটি অন্য জনের বা জমি এবং বীজ একজনের, লাঙ্গল-গরু ও মেহনত অন্য জনের, অথবা জমি, বীজ ও লাঙ্গল-গরু একজনের এবং মেহ্নত অন্য জনের অথবা জমি এবং লাঙ্গল-গরু একজনের, বীজ এবং মেহ্নত অন্য জনের—এই সব রকমেই জমি বর্গা দেওয়া জায়েয। ভাগ কি রকম হইবে সেটা নির্ভর করে দুইজনের স্বাধীন ইচ্ছার উপর; দুইজনে রাজী হইয়া যাহা ধার্য করিবে সেইটাই ওয়াজিব হইবে। কার কত অংশ হইবে সেটা দুইজনে মিলিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে, নতুবা জায়েয হইবে না। এইরূপে অংশ হিসাবে ধার্য না করিয়া যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করে যেমন, এক মণ আমার, বাকী সব তোমার বা জমির এই পার্শ্বে যা কিছু হইবে সেটা আমার আর বাকীটা তোমার—তাহা হইলে ইহা জায়েয হইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার পরিবর্তে অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধানের বা চাউলের পরিবর্তে জমি বাৎসরিক পত্তন দেওয়া অর্থাৎ ইজারা দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু যদি শর্ত করা হয় যে, এই জমিতে যে ধান হইবে, সেই ধানের দুই মণ ধান আমাকে দিতে হইবে, তবে তাহা জায়েয হইবে না।

ছোলেহ করা

১। **মাসআলা ঃ** ছোলেহ করিবার এবং শর্ত করিবার অধিকার মানুষের আছে। যে যাহা ছোলেহ করিবে বা শর্ত করিবে, তার জন্য সেটা পালন করা ওয়াজেব হইবে—যাবৎ ছোলেহ এবং শর্ত শরীঅতের সীমা লংঘন না করিবে।

স্বীকার-উক্তি, দাবী, সাক্ষ্য ও বিচার

মানুষ যাহাকিছু নিজ মুখে নিজের উপর স্বীকার করিবে, সেজন্য সে দায়ী হইবে; তাহার জন্য আর কোন সাক্ষী-সাবুতের দরকার হইবে না। অন্যের উপর যদি দাবী করে, তবে তাহার জন্য অবশ্য সত্য সাক্ষীর দরকার হইবে। সত্য সাক্ষী ব্যতিরেকে অন্যের উপর কিছু প্রমাণ করা যাইবে

না। কাহারও বিরুদ্ধে যদি কেহ কিছু দাবী করে, তবে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, বাদীর ঐ দাবী স্বীকার করে কি না। যদি স্বীকার করে, তবে কোন অসুবিধা রহিল না। আর যদি স্বীকার না করে, তবে বাদী পক্ষ যদি তাহাকে কছম খাওয়াইতে চায়, তবে তাহার কছম খাইতে হইবে।

মিথ্যা দাবী করা, মিথ্যা মোকদ্দমা করা গোনাহ্ কবীরা। মিথ্যা কছম খাওয়া, মিথ্যা হলফ করা গোনাহ্ কবীরা। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া গোনাহ্ কবীরা। অন্যায় বা পক্ষপাতিত্ব করিয়া বিচার করাও গোনাহ্ কবীরা। বিচারকের দায়িত্ব সত্য সাক্ষী তদন্ত করিয়া বাহির করা এবং সত্য সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া বিচার করা, তদন্ত করা সত্ত্বেও যদি মিথ্যা না ধরিতে পারে, তবে অবশ্য বিচারক দায়ী হইবে না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকিলে সাক্ষীই দায়ী হইবে।

সাক্ষী

১। **মাসআলা ঃ** সত্য সাক্ষ্য দান করা ফরয, মিথ্যা সাক্ষ্য দান হারাম, গোনাহে কবীরা। যখন কাহারও হক নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, তখন সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। যেনার সাক্ষ্য গোপন করা আফযাল। চারিজনে একত্রে যেনার সাক্ষ্য না দিলে, একজন দুইজন বা তিনজনে সাক্ষ্য দিলে হদ্ লাগানোর উপযুক্ত হইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** যেনা প্রমাণ করার জন্য চারিজন চরিত্রবান সত্যবাদী পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন। চুরি, মিথ্যা, তোহ্মাত, মদ্যপান এবং মানুষ খুন প্রমাণ করার জন্য দুইজন চরিত্রবান সত্যবাদী সাক্ষীর প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে দুইজন চরিত্রবান সত্যবাদী পুরুষ বা একজন চরিত্রবান সত্যবাদী পুরুষ এবং দুইজন চরিত্রবতী সত্যবাদিনী স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে। অবশ্য স্ত্রীলোকের এমন বিষয় যাহা পুরুষের জানার কথা নয়—যেমন, প্রসব, কৌমার্য, সহবাসের অনুপযুক্ততা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

৩। **মাসআলা ঃ** সব ক্ষেত্রে সাক্ষী সত্যবাদী হইতে হইবে। মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য কোথাও গ্রহণযোগ্য নহে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রামাণ হইলে সে শাস্তির উপযুক্ত। হযরত ওমর (রাঃ) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশ কোড়া মারার শাস্তি প্রদান করিয়াছেন।

অন্তিমকালে

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চিন্তা খাতেমা-বিল-খায়ের অর্থাৎ ঈমানের সহিত মউত। যখন মানুষ ক্ষণস্থায়ী জীবন পার হইয়া পরপারের যাত্রী হয়, তখন তাহার কর্তব্য হয় পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের সরঞ্জাম এইখান হইতেই যোগাড় করিয়া নেওয়া। গোনাহ্-খাতার জন্য তওবা এস্তেগফার করিয়া, কাহারও কোন দেনা থাকিলে তাহা পরিশোধ করিয়া, যাহাদের সঙ্গে উঠা-বসা, চলা-ফেরা করা হইয়াছে তাহাদের কাছে মাফ চাহিয়া নেওয়া—এগুলি তখনকার কর্তব্য—যাহাতে পবিত্র আত্মা নিয়া মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রেম ও ভালবাসা রাখিয়া আল্লাহ্‌র যেকর কলেমা শরীফ পড়িতে পড়িতে যে মাওলার কাছ হইতে তাহার জান আসিয়াছে, সেই মাওলার কাছেই আবার জানকে সোপর্দ করিয়া দেওয়া যায়। —অনুবাদক

অছিয়ত

১। **মাসআলা ঃ** (মৃত্যুকালে কিছু আদেশ উপদেশ দান করিয়া যাওয়াকে অছিয়ত বলে।) আমার মৃত্যুর পরে এত মাল বা এত টাকা অমুককে বা অমুক সৎকাজে দান করিও—এইরূপ বলার নাম অছিয়ত। এইরূপ কথা যদি জীবিত অবস্থায় সুস্থ শরীরেও বলে তাহাও অছিয়ত হইবে। আর যদি যে রোগে মারা যায়, সেই রোগ-শয্যায় বলে তাহাও অছিয়ত হইবে। আর যদি রুগ্ন অবস্থায় বলে এবং সে রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহাও অছিয়ত হইবে। যদি নিজ হাতে দান করে বা কাহারও করয মাফ করিয়া দেয়, তবে ইহা সুস্থ শরীরে হইলে দান হইবে, সর্বপ্রকারে জায়েয; আর যদি এমন রোগের অবস্থায় বলে, যে রোগ হইতে সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে, তবে তাহাও দুরুস্ত হইবে। আর যদি রুগ্ন অবস্থায় দান করে, কিন্তু সেই রোগেই সে মারা যায়, তবে সেটা (দান হইবে না,) অছিয়ত হইবে। অছিয়ত সম্বন্ধে সামনে মাসআলা বয়ান করা হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও জিম্মায় কাযা নামায থাকিয়া থাকে, কাযা রোযা থাকিয়া থাকে, যাকাৎ না দিয়া থাকে, (কোরবানী না দিয়া থাকে,) কছমের কাফ্ফারা আদায় না করিয়া থাকে, রোযার কাফ্ফারা আদায় না করিয়া থাকে, কছমের (শর্ত পুরা হওয়া সত্ত্বেও মান্নত আদায় না করিয়া থাকে, বা ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করিয়া থাকে, অথচ) এগুলি আদায় করার মত অর্থ-সংগতি তাহার আছে, তবে মৃত্যুর পূর্বে এইগুলি আদায় করার জন্য অছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। এইরূপে যদি কাহারও দেনা থাকিয়া থাকে অথবা তাহার নিকট অন্য কাহারও মাল আমানত রাখা থাকে, তবে করয আদায় করিয়া দেওয়ার জন্য, আমানতের মাল যারটা তাহাকে দিয়া দেওয়ার জন্য মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব (এইসব অছিয়ত না করিয়া মরিলে ভীষণ গোনাহ্গার হইবে)। এতদ্ব্যতীত যদি কোন আত্মীয় গরীব হয় এবং শরীঅত মতে ওয়ারেস হয় না, অথচ মৃত ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি আছে, তাহাদিগকে কিছু দেওয়ানের ব্যবস্থা করা বা অছিয়ত করা মোস্তাহাব।[১] এছাড়া অন্যান্যদের জন্য অছিয়ত করা, না করা তাহার ইচ্ছা।

৩। **মাসআলা ঃ** মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে সর্বপ্রথমে তাহার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর যাহাকিছু থাকে, তাহার দ্বারা আগে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। এমন কি, যদি তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও তাহার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, তবে তাহাও করিতে হইবে। ওয়ারিসগণ কিছু না পাইলেও তাহার ঋণ আগে পরিশোধ করিতে হইবে। ঋণ পরিশোধের অছিয়ত না করিয়া থাকিলেও ঐ ভাবে আগে ঋণ পরিশোধ করিতেই হইবে। (কেননা, এটা হক্কুল এবাদ। ঋণ পরিশোধের পর কিছু বাঁচিলে ওয়ারিসগণ পাইবে, নতুবা পাইবে না) এছাড়া অন্যান্য যত অছিয়ত (এমন কি ফরয যাকাতের অছিয়তও)

টিকা

১ কোন কোন ইমামের নিকট ওয়াজিব, কোন কোন ইমামের নিকট মোস্তাহাব।

তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তির মধ্যে তাহার করিবার এখতিয়ার আছে, তার বেশীর মধ্যে নহে এবং অছিয়ত করিয়া থাকিলে তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি পর্যন্তই অছিয়ত পালনের জন্য খরচ করা ওয়ারিসদিগের উপর ওয়াজিব, তাহার বেশীতে নয়। অবশ্য ওয়ারিসগণ সকলে খুশী হইয়া যদি নিজ নিজ অংশ না নেয় এবং বলে যে, অছিয়ত পুরা কর, তবে তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়তে ব্যয় করা জায়েয আছে। কিন্তু এখানে সাবধান, ওয়ারিসগণের মধ্যে কেহ নাবালেগ থাকিলে তাহার অংশ সে অনুমতি দিলেও কাহার খরচ করিবার অধিকার নাই (এবং যাহার অংশ তাহার বিনা অনুমতিতে অন্যের খবচ করিবারও অধিকার নাই।)

৪। **মাসআলা ঃ** যাহারা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হইবে, তাহাদের কাহারও জন্য অছিয়ত করিলে সে অছিয়ত ছহীহ্ হইবে না। আত্মীয়দের মধ্যে যাহারা ওয়ারিস হইবে না, তাহাদের জন্য অছিয়ত করিতে পারিবে; আত্মীয় ছাড়া অন্যদের জন্যও অছিয়ত করিতে পারিবে। কিন্তু (ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট) মোট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত করিতে পারিবে, তার বেশী নয়। যদি কোন ওয়ারিসের জন্য অছিয়ত করা হয় এবং বাকী ওয়ারিসগণ খুশীর সংগে তাহাতে এজাযত দেয়, তবে তাহা পালন করা যাইবে। এইরূপে যদি সম্পত্তির তিন ভাগের চেয়ে বেশীরও অছিয়ত করে এবং সব ওয়ারিসগণ খুশীর সঙ্গে এজাযত দেয়, তবে তাহাও জারি করা যাইবে; অন্যথায় এক তৃতীয়াংশই পাইবে। কিন্তু ওয়ারিসগণের মধ্যে কেহ কেহ নাবালেগ থাকিলে তাহার এজাযত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** যদিও সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ অছিয়ত করার এখতিয়ার আছে কিন্তু পূর্ণ তৃতীয়াংশ অছিয়ত না করিয়া কম অছিয়ত করাই উত্তম; বরং খুব বড় মালদার না হইলে অছিয়ত না করাই উচিত; ওয়ারিসানদের জন্য ছাড়িয়া যাওয়া ভাল, যেন ভালভাবে আরামে জীবন যাপন করিতে পারে। কেননা, নিজের ওয়ারিসানদের স্বচ্ছন্দে আরামে ছাড়িয়া যাওয়াতেও ছওয়াব পাওয়া যায়। অবশ্য যদি দরকারী ও জরুরী অছিয়ত হয়, যেমন, নামায, রোযার ফিদিয়া, তবে উহার অছিয়ত সর্বাবস্থায় করিয়া যাইবে, নচেৎ গোনাহ্‌গার হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে বলিয়া গেল যে, আমার মৃত্যুর পর একশত টাকা দান করিয়া দিও। এরূপ অবস্থায় দেখিতে হইবে যে, তাহার কাফন ও ঋণ আদায়ের পর তিনশত টাকা তাহার সম্পত্তিতে আছে কি না। যদি তিনশত টাকা বা তাহারও বেশী থাকিয়া থাকে, তবে পুরা একশত টাকা দান করাই তাহার ওয়ারিসদিগের উপর ওয়াজিব হইবে। আর যদি তিনশত টাকার কম থাকে, তবে যাহা থাকিবে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ যত টাকা হয়, তত টাকা দান করা ওয়াজিব, তাহার বেশী ওয়াজিব হইবে না। আর সমস্ত ওয়ারিস খুশী হইয়া একশত পুরা করিয়া দান করিলে সেটা স্বতন্ত্র কথা (কিন্তু এইরূপ করা ওয়াজিব হইবে না।)

৭। **মাসআলা ঃ** যাহার আদৌ কোন ওয়ারিস নাই, সে তাহার ষোল আনা সম্পত্তিও দান করিয়া যাইতে পারিবে, তাহাতে আপত্তি নাই। যদি শুধু স্ত্রী থাকে এবং আর কেহ না থাকে, তবে চারি ভাগের তিন ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত করিতে পারিবে। যদি শুধু স্বামী থাকে এবং আর কেহ না থাকে, তবে অর্ধেক সম্পত্তির অছিয়ত করিতে পারিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** না-বালেগের অছিয়ত দুরুস্ত নহে।

৯। **মাসআলা ঃ** কেহ অছিয়ত করিল, আমার জানাযার নামায অমুক ব্যক্তি পড়িবে, অমুক শহরে, অমুক কবরস্থানে, অমুকের কবরের কাছে আমকে দাফন করিবে, অমুক কাপড় দ্বারা

আমাকে কাফন দিবে, আমার কবর পাকা করাইবে, কবরে বুরূজ তৈয়ার করিবে, কোন হাফেয ছাহেবকে বসাইয়া দিবে যে, কোরআন পড়িয়া পড়িয়া আমাকে বখশিয়া দিবে, তবে এই সমস্ত অছিয়ত পূর্ণ করা জরুরী নহে, বরং শেষের তিনটি অছিয়ত তো জায়েযই নহে। পুরা করিলে গোনাহ্গার হইবে।

১০। মাসআলা ঃ যদি কেহ অছিয়ত করিয়া স্বীয় অছিয়ত হইতে ফিরিয়া যায়, যেমন, বলে যে, এখন আর এই অছিয়তের ইচ্ছা নাই, উহা পছন্দ করি না, আমার এই অছিয়ত এতেবার করিও না ও মানিও না। এমতাবস্থায় ঐ অছিয়ত বাতেল হইয়া গেল।

১১। মাসআলা ঃ যেরূপ সম্পত্তির তৃতীয়াংশের বেশী অছিয়ত করা দুরুস্ত নাই, তেমনিভাবে রুগ্নাবস্থায় স্বীয় সম্পত্তির তৃতীয়াংশের অধিক নিজের নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচ যেমন, খাওয়া-দাওয়া পথ্য ইত্যাদি ব্যতীত খরচ করাও জায়েয নাই। যদি এক তৃতীয়াংশের বেশী কাহাকেও দিয়া দেয়, তবে ওয়ারিসানদের অনুমতি ব্যতীত এরূপ দেওয়া ছহীহ্ হইবে না। তৃতীয়াংশের চেয়ে যতটুকু বেশী দিয়াছে ওয়ারিসানদের ফেরত লইবার এখতিয়ার আছে, আর না-বালেগ ওয়ারিস যদি এজাযত দেয়, তবুও ধর্তব্য (মো'তাবার) নহে। আর কোন ওয়ারিসের এক তৃতীয়াংশের মধ্য হইতেও দেওয়া অন্যান্য ওয়ারিসানদের অনুমতি ব্যতীত জায়েয নাই। এরূপ হুকুম এই অবস্থায় হইবে, যখন সে জীবদ্দশায় (রুগ্নকালে) দান করে এবং গ্রহীতা দখলও করিয়া লয়। আর যদি এরূপ হয় যে, দান তো করিয়াছে কিন্তু এখনও দখল হয় নাই, তবে মৃত্যুর পরে দেওয়া একেবারেই বাতেল, সে কিছুই পাইবে না। সকল সম্পত্তি ওয়ারিসানদের হক। রুগ্নাবস্থায় আল্লাহ্র রাস্তায় এবং নেক কাজে দান করারও এই হুকুম। মোটকথা, এক তৃতীয়াংশের বেশী কোন প্রকারেই খরচ করা জায়েয নাই।

১২। মাসআলা ঃ রুগ্ন ব্যক্তির কাছে খেদমতের জন্য কিছু লোক আসিল, কিছুদিন এখানে কাটিল। এখানেই থাকে, রোগীর সম্পত্তি হইতে খায়। এমতাবস্থায় যদি রোগীর খেদমতের জন্য তাহাদের থাকার আবশ্যক হয়, তবে কোন ক্ষতি নাই। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে তাহাদেরও খাতিরদারী খাওয়া-দাওয়ায় এক তৃতীয়াংশের বেশী ব্যয় করা জায়েয নহে। আর যদি রোগীর সেবা ও খেদমতের আবশ্যকও না হয় এবং তাহারা ওয়ারিস হয়, তবে তৃতীয়াংশের কমও ব্যয় করা জায়েয নাই। অর্থাৎ, রুগ্ন ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে ওয়ারিস মেহ্মানদের খাওয়া জায়েয নাই। অবশ্য যদি সকল ওয়ারিসগণ খুশী হইয়া অনুমতি দেয়, তবে জায়েয হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ যে রোগে মরিয়াছে, সেই রোগ-শয্যায় অন্যের নিকট তাহার প্রাপ্য মাফ করার এখতিয়ার তাহার নাই। যদি ওয়ারিসেরা কোন ঋণ মাফ করিয়া দেয়, তাহাও মাফ হইবে না। যদি সকল ওয়ারিস এই মাফ মঞ্জুর করে এবং সকলে বালেগ হয়, তবে মাফ হইবে।

আর যদি ওয়ারিস ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহার দেনা মাফ করিয়া দেয়, তবে সমস্ত সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ মাফ হইবে, তাহার বেশী মাফ হইবে না। স্ত্রী যদি মৃত্যুকালে নিজে মহর মাফ করিয়া দেয়, এই মাফ করা ছহীহ্ হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ গর্ভাবস্থায় প্রসব-ব্যথা শুরু হওয়ার পর যদি কাহাকেও কিছু দেয় কিম্বা মহরানা ইত্যাদি মাফ করিয়া দেয়, তবে ইহার হুকুমও মৃত্যু রোগে দান করার হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ, খোদা না খাস্তা যদি ঐ প্রসবাবস্থায় মারা যায়, তবে তো অছিয়তের মধ্যে গণ্য হইবে, অর্থাৎ, ওয়ারিসের জন্য কিছুই জায়েয নাই। আর ওয়ারিস না হইলে এক তৃতীয়াংশের বেশী

দেওয়া কিংবা মাফ করিয়া দেওয়ার এখতিয়ার নাই। অবশ্য যদি নিরাপদে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে এখন ঐ সমস্ত দেওয়া লওয়া এবং মাফ করা ছহীহ্ হইয়া গেল।

১৫। মাসআলা ঃ মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি হইতে দাফন-কাফন করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে সর্বপ্রথম তাহার ঋণ শোধ করা চাই, অছিয়ত করুক বা না করুক। সর্বাবস্থায় সর্বাগ্রে ঋণ শোধ করিতে হইবে। বিবির মহরানাও ঋণের অন্তর্ভুক্ত। যদি কর্জ না থাকে কিম্বা কর্জ শোধ করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তখন দেখিতে হইবে যে, অছিয়ত করিয়াছে কি না, যদি অছিয়ত করিয়া থাকে, তবে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে পরিশোধ করা হইবে। যদি অছিয়ত না করিয়া থাকে, অথবা অছিয়ত পরিশোধ করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা সবই ওয়ারিসগণের হক। কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহার অংশ তাহাকে দেওয়া কর্তব্য। বর্তমানে যে দস্তুর আছে, যে যাহাকিছু হাতে পাইল হস্তগত করিল ইহা সাংঘাতিক গোনাহ্। এখানে না দিলে কিয়ামতের দিন দিতে হইবে। সেখানে টাকার বিনিময়ে নেকী দিতে হইবে। এইরূপে মেয়েদের অংশও তাহাদিগকে দিতে হইবে। শরীঅত অনুযায়ী তাহাদেরও হক আছে।

১৬। মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে লোকদের মেহমানদারী, আগন্তুকদের খাতিরদারী, খাওয়ান-দাওয়ান, ছদকা-খয়রাত ইত্যাদি কিছুই জায়েয নাই। এমনিভাবে মৃত্যুর পর হইতে দাফন কার্য সম্পাদন পর্যন্ত যাহাকিছু চাউল ডাল ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে দান করাও হারাম। ইহাতে মৃত ব্যক্তির জন্য কোন ছওয়াবই পৌঁছিবে না ; বরং ছওয়াব মনে করা কঠিন গোনাহ্। কেননা এই সম্পত্তি তো এখন ওয়ারিসদের হইয়া গেল, অন্যের হক নষ্ট করিয়া দান করা, অন্যের মাল চুরি করিয়া দান করার ন্যায়। সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া উচিত। তারপর তাহাদের এখতিয়ারে নিজ নিজ অংশ হইতে ইচ্ছা করিলে শরীঅত সম্মতভাবে কিছু দান-খয়রাত করিতে পারে বা নাও করিতে পারে ; বরং ওয়ারিসগণের নিকট হইতে (বন্টনের পূর্বে) খরচ করা বা দান-খয়রাত করার জন্য অনুমতিও লওয়া উচিত নাহে। কেননা, অনুমতি লইতে গেলে বদনামির ভয়ে শুধু মুখে মুখে অনুমতি দেয়, অন্তরে দেয় না এরূপ অনুমতির কোনই মূল্য নাই।

১৭। মাসআলা ঃ এমনিভাবে যে প্রথা আছে, মৃত ব্যক্তির ব্যবহারের কাপড়-চোপড় খয়রাত করিয়া দেয়। ইহাও ওয়ারিসদের বিনানুমতিতে কিছুতেই জায়েয নাই। আর যদি ওয়ারিসানদের কেহ নাবালেগ হয়, তবে এজাযত দিলেও জায়েয হইবে না। আগে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিবে, অতঃপর বালেগ ওয়ারিসগণ স্বীয় অংশ হইতে যাহা ইচ্ছা দিয়া দিতে পারে। ভাগ করা ব্যতীত কখনও দিবে না।

ফারায়েযের অংশ (মূল কিতাবে নাই)

১। মাসআলা ঃ মানুষ মরিয়া গেলে হুকুমতের কর্তব্য বিশ্বস্ত লোক দ্বারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে যার যা হক আছে তাহা তাহাদের দিয়া দেওয়া। বিশেষতঃ শান্তিপ্রিয় দুর্বলের সাহায্যের জন্যই হুকুমত। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনই হুকুমতের প্রথম ফরয। হুকুমত যদি তাহাদের কর্তব্য পালন নাও করে, তবুও সমাজের জনসাধারণের তাহাদের ফরয আদায় করিতেই হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকার লোক মীরাস পাইবে না—(১) যদি কেহ কাহাকেও কতল করিয়া থাকে, তবে সেই কাতেল মাকতুল ব্যক্তির কোন মীরাস পাইবে না। (২) যদি (নাউযু বিল্লাহ্) দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে বা ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যায়, তবে সে মীরাস পাইবে না। (৩) কেহ যদি বে-দ্বীন কাফির অবস্থায় থাকে, সে মুসলমানদের মীরাস পাইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** ওয়ারিস তিন প্রকার হয়—(১) যবিল ফুরূয—অর্থাৎ যাহাদের অংশ কোরআন শরীফে নির্ধারিত আছে। (২) আছাবা—অর্থাৎ যাহাদের অংশ ঐ ভাবে নির্ধারিত নাই বটে, কিন্তু যবিল ফুরূযদের অংশ নেওয়ার পর যাহাকিছু অবশিষ্ট থাকিবে, সবই এই আছাবারা পাইবে। আছাবা হামেশা পুরুষ হইবে; যেমন ছেলে, পোতা, বাপ, দাদা, চাচা, ভাতিজা ইত্যাদি অথবা মেয়েলোক হইলে পুরুষের সঙ্গে বা পুরুষের মাধ্যমে তাহার যোগাযোগ হইবে, যেমন ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতি। যবিল আরহাম—ইহারা হামেশা মেয়েলোক হইবে, আর পুরুষ হইলে কোন মেয়েলোকের মাধ্যমে তাহার যোগাযোগ হইবে, যেমন নানা, নানী ইত্যাদি।

৪। **মাসআলা ঃ** কোরআন শরীফে ৮ জন মেয়েলোক এবং ; ৪ জন পুরুষের জন্য অংশ নির্ধারিত আছে। ইহাদের অংশ আগে দিতে হইবে। তারপর অবশিষ্ট থাকিলে তাহা আছাবাদিগকে দিতে হইবে, আছাবাদের নিয়ম এই যে, নিকটবর্তী থাকিলে দূরবর্তী পাইবে না। তারপর দুই সম্পর্কওয়ালা এক সম্পর্কওয়ালা অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে এবং বেটা অগ্রগণ্য হইবে বাপের উপর।

যবিল ফুরূযদের তফছীল

১। **মা**—১/৬ অংশ পাইবে, যদি মাইয়েতের সন্তান থাকে অথবা ভাই-বোনের দুইজন থাকে; ১/৩ অংশ পাইবে, যদি সন্তান না থাকে অথবা ভাই-বোনের দুইজন না থাকে।

২। **বাপ**—১/৬ অংশ পাইবে, যদি মৃতের ছেলে থাকে বা ছেলের ছেলে থাকে। যদি মৃতের ছেলে বা ছেলের ছেলে না থাকে, শুধু মেয়ে থাকে বা পুতী থাকে, তবে বাপ অবশিষ্ট সব পাইবে।

৩। **দাদা**—বাপ থাকিলে দাদা কিছুই পাইবে না, বাপ না থাকিলে দাদা ১/৬ অংশ পাইবে।

৪। **দাদী-নানী**—মা থাকিলে দাদী বা নানী কেহ কিছু পাইবে না। বাপ-মা কেহ যদি না থাকে, আর দাদী, নানী উভয়ে থাকে, তবে ১/৬ অংশ দাদী ও নানী দুইজনে সমান ভাগ করিয়া নিবে। নানা যবিল ফুরূযও নহে আছাবাও নহে। যদি যবিল ফরূযের মধ্যে কেহ না থাকে, আর আছাবার মধ্যেও কেহ না থাকে, তবে যবিল আরহাম হিসাবে হয়ত নানা কিছু পাইতে পারে, নতুবা নহে।

৫। **স্ত্রী**—১/৮ অংশ পাইবে যদি মৃতের এই স্ত্রীর পক্ষের বা অন্য পক্ষের বেটা বা বেটি বা বেটার ঘরের বেটা বা বেটি কোন সন্তান থাকে। আর যদি এরূপ কোন সন্তান না থাকে, তবে স্ত্রী পাইবে ১/৪ অংশ । স্ত্রী যদি একাধিক থাকে, তবে যে কয়জন থাকিবে তাহারা ঐ ১/৮ বা ১/৪ অংশ সমান ভাগ করিয়া নিবে।

৬। **স্বামী**—সন্তান থাকিলে (চাই এ স্বামীর ঔরসে হউক, চাই পূর্বের স্বামীর ঔরসের ছেলে বা মেয়ে হউক) স্বামী পাইবে ১/৪ অংশ, আর সন্তান না থাকিলে স্বামী পাইবে ১/২ অংশ।

৭। **কন্যা**—পুত্র না থাকা অবস্থায় এক কন্যা থাকিলে সে ১/২ অংশ পাইবে, একাধিক কন্যা হইলে যে কয়জন হইবে, সকলে এক সাথে ২/৩ অংশ পাইবে। আর যদি পুত্র থাকে, তবে প্রতি পুত্র প্রতি কন্যার দুই গুণ—এইভাবে ভাগ করিবে।

৮। **পুত্নী**—বেটা-ছেলে থাকিলে পোতা-পুত্নীরা কেহ কিছু পাইবে না। আর বেটা ছেলে না থাকিলে পোতা পুত্নীরা পাইবে। বেটা ছেলে এবং পোতার কোন অংশ নির্ধারিত নাই। বেটা-ছেলে থাকিলে যবিল ফুরূযদের অংশ দেওয়ার পর যাহাকিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সবই পাইবে। আর বেটা-ছেলে কেহ না থাকিলে পোতা-পুত্নীরা বেটার কায়েম-মোকাম হইবে অর্থাৎ আছাবা হিসাবে পাইবে।

৯। **ভগ্নী**—ভগ্নী তিন প্রকার—(১) মা-শরীক ভগ্নী, (২) বাপ-শরীক ভগ্নী এবং (৩) মা ও বাপ উভয় শরীক হাকীকী ভগ্নী।

(১) মা-শরীক ভগ্নী বা ভাই একজন থাকিলে ১/৬ অংশ পাইবে আর একাধিক থাকিলে সকলে মিলিয়া ১/৩ অংশ পাইবে। এখানে ভাই ও ভগ্নীর সমান অংশ হইবে। মৃতের সন্তান থাকিলে বা বাপ-দাদা থাকিলে মা-শরীক ভাই-ভগ্নীরা কেহই কিছু পাইবে না।

(২) বাপ-শরীক ভগ্নী—আপন হাকীকী ভগ্নীরই মত। কিন্তু মাইয়েতের আপন হাকীকী ভাই থাকিলে, বাপ-শরীক ভাই-বোনেরা কেহ কিছু পাইবে না।

(৩) মা ও বাপ-শরীক ভগ্নী—মাইয়েতের বেটা ছেলে থাকিলে বা পোতা থাকিলে অথবা বাপ থাকিলে আপন হাকীকী ভগ্নীরা বা ভাইরাও কেহ কিছু পাইবে না। যদি মাত্র এক মেয়ে থাকে, তবে সেই মেয়ে পাইবে ১/২ অংশ আর ভগ্নী পাইবে ১/৬ অংশ। আর যদি দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকে আর ভাই-ভগ্নী থাকে, তবে মেয়েরা পাইবে ২/৩ অংশ; ভাই-ভগ্নী বাকী ১/৩ অংশ পাইবে (কিন্তু ভাইকে ভগ্নীর দুইগুণ—এই হিসাবে ভাগ করিতে হইবে)।

(প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব ৮৩ হাজার আইন [মাসআলা] কোরআন হাদীস হইতে বাহির করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩৮ হাজার মাত্র ইবাদত বন্দেগী সম্বন্ধে এবং বাকী ৪৫ হাজার অর্থনীতি এবং রাজনীতি সম্বন্ধে।

এখানে সহজ সরল কতকগুলি মাসআলা বা শরীঅতের আইন অতি সংক্ষেপে শুধু সর্বসাধারণের জন্য লেখা হইয়াছে। অনেক জটিল এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আইন রহিয়াছে, যেগুলি বড় বড় কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যখন যে ঘটনা সামনে পেশ আসে সে সম্পর্কে আপনারা সব সময়ই মাসআলা বা শরীঅতের আইন সম্বন্ধে মোহাক্কেক আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সে অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং সামাজিক জীবন পরিচালিত করিবেন। যার-তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করিবেন না; অবার না জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের মনগড়া মত কাজ করিবেন না। অন্ততঃপক্ষে যে আলেম ছাহেব পূর্ণ জালালাইন শরীফ দুই জিলদ আদ্যোপান্ত, পূর্ণ মিশ্‌কাত শরীফ দুই জিল্‌দ আদ্যোপান্ত এবং পূর্ণ হেদায়া চারি জিলদ আদ্যোপান্ত আসল আরবী ভাষায় কোন কামেল ওস্তাদের নিকট ইবারতসহ বুঝিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিবেন। উহা অপেক্ষা কম এলেম হইলে তাহাকে আলেম বলা যায় না।)

॥ পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

ষষ্ঠ খণ্ড (উপক্রমণিকা)

সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সমাজের প্রচলিত কুপ্রথার সংশোধন

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এমন একটি জাতিরূপে গঠন করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদিগকে এমন একটি ধর্ম-শরীঅত তথা আদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থা দান করিয়া গিয়াছেন যাহা সর্বদিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই জন্যই তিনি সমাজ ব্যবস্থায় অন্য জাতির অনুকরণ (পরানুকরণ) করিতে এবং নিজেদের মধ্যে হীনতা নীচতা (Inferiority Complex) আনিতে আমাদিগকে অতি কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। হাদীস শরীফে আছেঃ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ইহার মর্ম এই যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা একথা উত্তমরূপে জানিয়া রাখ যে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যদি তোমরা অন্য কোন বিজাতির অনুকরণ কর, তবে যে যেই জাতির অনুসরণ করিবে, সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। কোরআন শরীফে আছেঃ وَلَاتَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ইহার মর্মার্থ এই যে, "হে মুসলমানগণ; তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ যে, যাহারা নিজেদের উপর নিজেরা যুলুম করিয়া আল্লাহ্‌কে এবং আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিনিধিকে অস্বীকার করিয়া কাফের হইয়াছে তাহাদের দিকে তোমরা ঝুঁকিও না; অর্থাৎ, তাহাদের অনুকরণ অনুসরণ করিও না বা নিজেদের ধর্মকে এবং আদর্শকে হীন মনে রাখিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বকে মনে স্থান দিও না; যদি তোমরা তদ্রূপ কর, তবে তোমাদের দোযখের আযাব ভোগ করিতে হইবে—একথা ভালরূপে জানিয়া রাখিও।" মানুষ অন্যের অনুসরণ করে না, যাবৎ সে অন্যের সেই আদর্শকে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দরতম মনে না করে। অতএব, যাহারা মুসলিম জাতির মেম্বর এবং মুসলিম সমাজের সভ্য হওয়া সত্ত্বেও অন্য জাতির অনুকরণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নির্ভুল নীতিকে এবং রাসূলের শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম আদর্শের অবমাননা করিয়াছে, কাজেই দুনিয়াতে এবং আখেরাতে তাহাদের আযাব ভোগ করিতে হইবে। এই জন্য যে-সব মুসলমানের অন্য জাতির সঙ্গে মেলা-মেশা ও উঠা-বসার প্রয়োজন হয়, তাহাদের জন্য উভয় জাতির সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণের একান্ত প্রয়োজন আর যাহাদের অন্য জাতির সঙ্গে মেলা-মেশা ও উঠা-বসার দরকার না হয় বা সুযোগ না ঘটে, তাহারা যদি শুধু নিজেদের ধর্মের ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা জানিয়া তদ্রূপ জীবন যাপন করে, তবে তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। এই যুগের মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এবাদত-বন্দেগী,

ধর্ম-বিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থার ন্যায় ইসলামের সমাজ ব্যবস্থাও সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য, প্রত্যেক ব্যাপারে নিজেদের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা জানিয়া তদনুযায়ী সমাজ জীবন যাপন করা। পরানুসরণ করা বা নিজেদের সমাজ ব্যবস্থার প্রতি হীনতাবোধ আনয়ন করা কোন মুসলমানের পক্ষে কিছুতেই উচিত নহে। অন্যথায় তাহাদের পতন ও ধ্বংস অনিবার্য। হযরত মাওলানা থানভী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহে তাঁহার যমানায় এবং তাঁহার সময়ের কুসংস্কারগুলির সংশোধন লিখিয়াছেন। আমি তাঁহার কথাগুলির অনুবাদ করি নাই; বরং তাঁহারই অনুকরণে তাঁহারই কথাগুলি অবলম্বনে বর্তমান যুগের কু-সংস্কারগুলির সংশোধন লেখার চেষ্টা করিয়াছি।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আনিয়া আমাদিগকে এমন কতকগুলি সধারণ সূত্র এবং মাপকাঠি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যাহা দ্বারা সেই শিক্ষায় অভিজ্ঞগণ নব প্রচলিত কার্যগুলির কোন্‌টি অনুমোদনযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌টি অননুমোদনীয় ও গ্রহণের অযোগ্য তাহা বাছাই করিয়া দেখিতে পারেন। কাজেই যে সমস্ত প্রথা সে যমানায় ছিল না, পরবর্তী যুগে চালু হইয়াছে, ইহাদিগকে সেই মাপকাঠি দ্বারা মাপিয়া গ্রহণ বা বর্জন করিতে হইবে।

আল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র রাসূল যে কার্যকে 'কর' বলিয়া স্পষ্টভাবে আদেশ করিয়াছেন, তাহাকে বলা হয় 'ফরয' এবং 'ওয়াজিব; আর যাহা করিও না বলিয়া স্পষ্টভাবে নিষেধ করিয়াছেন তাহাকে বলা হয় 'হারাম'। আর যাহা করিবার জন্য স্পষ্ট আদেশ করেন নাই, কিন্তু পছন্দ করিয়াছেন, উহাকে বলা হয়, 'মুস্তাহাব'। আর যাহা করিতে স্পষ্ট নিষেধ করেন নাই, কিন্তু না-পছন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে বলা হয়, 'মাক্‌রূহ'। তার মধ্যে আবার দুইটি স্তর আছেঃ যাহাকে বেশী পছন্দ করিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) এবং তাঁহার ছাহাবীগণ সব সময় আমল করিয়াছেন, উহাকে বলা হয় সুন্নৎ। আবার যে সুন্নতের জন্য তাকীদ পাওয়া গিয়াছে উহাকে বলা হয় সুন্নতে মুআক্কাদাহ্‌; আর যাহা বেশী না-পছন্দ করা হইয়াছে উহাকে সলফে ছালেহীন (প্রাচীন বুযুর্গগণ) সর্বদা বর্জন করিয়াই চলিয়াছেন। উহাকে বলা হয় 'মাক্‌রূহ তাহরীমী'। আর যাহা কম না-পছন্দ করা হইয়াছে উহাকে বলে, মাক্‌রূহ তান্‌বীহী' এবং যেটার বেলায় মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে—করা না করা তাহার ইচ্ছাধীন, সেটাকে বলা হয় 'মুবাহ্‌'। আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ, পছন্দ অপছন্দ জানার উপায় একমাত্র আল্লাহ্‌র কোরআন এবং আল্লাহ্‌র রাসূল। আর রাসূলের আদেশ-নিষেধ পছন্দ বা অপছন্দ জানিবার উপায় রাসূলের হাদীস এবং তাঁহার ছাহাবীগণের চালচলন বা জীবনযাপন পদ্ধতি।

আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল প্রদত্ত কোরআন ও হাদীসের এই মাপকাঠি দ্বারা যাঁহারা কোরআন ও হাদীসের অভিজ্ঞতা হাছিল করিয়া তদনুযায়ী জীবন গঠন করতঃ উহারই আলোচনা ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা দেশ প্রথাগুলিকে মাপিয়া বা যাছাই বাছাই করিয়া কোন্‌টা গ্রহণ করা উচিত এবং কোন্‌টা বর্জন করা উচিত তাহা বাতাইয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র নীতি অনুসারে যে নিখুঁত ও নির্ভুল আদর্শ আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শ ছাড়িয়া অন্য কোন জাতির বা ব্যক্তির আদর্শ গ্রহণ করা যে কিছুতেই উচিত নহে, তাহাও তাঁহারা তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এখন সেগুলি এক একটি করিয়া আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, সমাজের আচার-ব্যবহার এবং দেশপ্রথা দুই প্রকার। এক প্রকার প্রথা এমন আছে যে, তাহার উপকারিতা অপকারিতা বা উহা খোদা রাসূলের আদেশকৃত বা অনুমোদিত কি না তাহার কিছুই দেখা যায় না শুধু অন্ধানুকরণ বা সমাজের বদ রসম বলা যায়। আর এক প্রকারের প্রথা এমন আছে, যাহা আল্লাহ্‌র আদেশ বা রাসূলের আদর্শে প্রচার করা হইয়াছে; তাহার প্রত্যেকটির মূলেই তাবলীগ আছে এবং আল্লাহ্ রাসূলের মধ্যে যোগাযোগ আছে। এগুলিকে রসম বলা যায় না, Tradition বা সংস্কারও বলা যায় না। কারণ এগুলির প্রত্যেকটিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেকটিই আধ্যাত্মিকতার সংগে সংশ্লিষ্ট। কাজেই এরূপ প্রথাকে প্রথা না বলিয়া সুন্নত কিম্বা গুরুত্ব বিশেষ ফরয বলা উচিত। কিন্তু মানুষ কোরআন হাদীসের সত্যিকার জ্ঞানের অভাবে অনেক সময় সত্যের সংগে মিথ্যা, কর্তব্যের সংগে অকর্তব্য বা সুন্নতের সংগে বেদআৎ মিশাইয়া ফেলে। সে সময় যাহারা প্রকৃতভাবে কোরআন হাদীসের জ্ঞানের আলোকের মালিক, তাঁহাদের উচিত মানুষের সুপথ দেখান ও কুপথ হইতে ফিরাইয়া রাখা।

শিশু পালন

আল্লাহ্ পাক যখন মানুষকে একটি সন্তান দান করেন, তখন সেই সন্তানের পিতা-মাতার উপর মস্ত বড় দায়িত্বের বোঝা চাপান হয়। সন্তানটি প্রকৃত প্রস্তাবে মা-বাপের কাছে আল্লাহ্‌র অতি বড় একটি আমনত। সন্তানের দেহকে পালন করা, দেহকে সুস্থ ও তন্দুরুস্ত রাখা যেমন মা-বাপের কর্তব্য এবং ফরয তদ্রূপ সন্তানের দেহ পালনের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মার প্রতিপালনও মাতা-পিতার প্রতি অতি বড় একটি দায়িত্ব। সন্তানের স্থূল দেহকে এমনভাবে পালন করিতে হইবে, যাহাতে তাহার আত্মা বক্র বা বিকৃত হইয়া না যায়। শিশুর মস্তিষ্ক হইয়াছে ফটো তোলার ক্যামেরার মত। ক্যামেরার সামনে যেমন বাঁকা বা সোজা যাহাকিছু ধরা যায় তাহারই ফটো ঐ ক্যামেরাতে উঠে, তদ্রূপ শিশুর সামনে ভাল-মন্দ যেরূপ আচার-ব্যবহার কথাবার্তা বা আলোচনা করা হয়, যেরূপ সংসর্গ দান করা হয়, উহা সেইরূপই শিশুর মন-মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া যায়। অতএব, খুব সতর্কতা সহকারে শিশুর মন-মস্তিষ্ককে খারাব কথা, খারাব আচার-ব্যবহার খারাব সংসর্গ বা খারাব পরিবেশ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে—বাঁচাইতে হইবে তাহার দেহকে, তাহার চক্ষুকে বেশী ঠাণ্ডা হইতে, বেশী গরম হইতে বেশী পানি বাতাস হইতে বা বেশী তাপ ও রৌদ্র হইতে। প্রসূতি ও শিশু পালনের যে সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ বলেন, সেই অনুযায়ী শিশুর পালন ও রক্ষণা-বেক্ষণ করা মাতা-পিতার মহান দায়িত্ব। মাতা-পিতার মৃত্যু হইয়া শিশু এতীম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এতীম পালনের দায়িত্ব ফারায়েয শাস্ত্রে বর্ণিত পর্যায় অনুসারে তাহার আছাবা জাতীয় আত্মীয়দের প্রতি বর্তিবে, তদভাবে সে দায়িত্ব যথাক্রমে সমাজের ও রাষ্ট্রে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন কথাবার্তা শিশুর কানে প্রবেশ করার পূর্বেই তাহার কানে আল্লাহ্‌র নাম প্রবেশ করান উচিত। ধাত্রী প্রসূতিকে সযত্নে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখিয়া, আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ পড়িতে পড়িতে শিশুকে ঈষদুষ্ণ পানি দ্বারা ধোয়াইয়া আঙ্গুল দিয়া আস্তে আস্তে মুখ পরিষ্কার করিয়া জলদি গা মোছাইয়া দিয়া কাঁথার মধ্যে লেপটাইয়া কোলে করিবে। এবং মহল্লায় কোন বুযুর্গ আলেম, ইমাম বা কোন নেক লোকের কোলে দিবে। তিনি স্বল্প আওয়াযে সুমধুর স্বরে শিশুর ডাইন কানের কাছে আযানের লফ্‌যগুলি বলিবেন এবং বাম কানের কাছে একামতের লফ্‌যগুলি বলিবেন। এইভাবে আযান একামত বলাকে 'তা'যীন' বলা হয়।

অতঃপর 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলিয়া স্বল্প মধু নিজের মুখে দিয়া পরে আঙ্গুল দিয়া শিশুর মুখে দিবেন। এইরূপে মধু দেওয়াকে 'তাহ্‌নীক' বলা হয়। তাহ্‌নীক যে মধুই হইতে হইবে তাহার কোন শর্ত নাই। উহার বদলে খোরমা বা অন্য কোন মিষ্টি জিনিস চিবাইয়া লালার মত করিয়া আঙ্গুল দ্বারা শিশুর মুখের ভিতরে তালুতে লাগাইয়া দেওয়া ভাল। তারপর স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পন্ডিত বা চিকিৎসকগণের নিয়ম নির্দেশ অনুযায়ী শিশুর স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হইবে। কিন্তু চিকিৎসকের এমন হওয়া দরকার যেন তিনি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে বিশেষতঃ প্রসূতি ও শিশু পালন সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—তাঁহার চরিত্রে যেন মিথ্যা বলার, নাপাক থাকার, নামায না পড়ার প্রভৃতি দোষ না থাকে। কারণ দূষিত চরিত্রের লোকের সামান্য সংসর্গেও মানুষের চরিত্র নষ্ট হইয়া থাকে। আজকাল মৌলভী ছাহেবগণ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিখে না, ইহা বড় আফসুসের কথা। আবার যাহারা ডাক্তারী পড়ে তাহাদের অনেকে রোযা নামায ছাড়িয়া দেয়, মিথ্যা কথা বলে, ধোঁকা দেয়, নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, হারাম হালালের ভেদ বিচার করে না। ইহাও সমাজের পক্ষে বড় বিপজ্জনক। সমাজকে এই আয়েব হইতে এবং এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে হইবে।

জন্মের সময় শিশুর জন্য এত সুন্দর ব্যবস্থা, এত সুন্দর আদর্শ আমাদের ইসলাম ধর্মে আছে যে, অন্য কোন সমাজে এমন সুন্দর আদর্শ পাওয়া যাইবে না। আযান একামতের দ্বারা শিশুর অন্তরকে আল্লাহ্‌র যেকরের সঙ্গে সম্পর্কিত করিতে দেওয়ায় এবং প্রথমে মধু ভক্ষণের দ্বারা শিশুর যে কত উপকার হয় এবং কত বিপদ আপদের হাত হইতে সে রক্ষা পায়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

আকীকাহ

শিশুর বয়স যখন সাত দিন হইবে, তখন পিতার প্রতি কয়েকটি কাজ কর্তব্য হয়। সন্তানের জন্মের সপ্তম দিবসে—(১) তাহার মাথার চুল কামাইয়া দিতে হইবে। (২) চুলের ওজনের স্বর্ণ বা রূপা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের দ্বারা শিশুর জন্য দো'আ করাইতে হইবে। (৩) কোন নেক বুযুর্গ 'আলেমের দ্বারা দো'আ করাইয়া ভাল নাম রাখিতে হইবে। (৪) আকীকা করিতে হইবে। সন্তান বেটা ছেলে হইলে তার জন্য দুইটি বকরী বা খাসী যবাহ্‌ করিয়া আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও গরীব দুঃখীকে খাওয়াইয়া তাহাদের দ্বারা শিশুর জন্য দো'আ করাইতে হইবে, যাহাতে শিশু দীর্ঘজীবী হয়, ভাল স্বাস্থ্য পায় এবং নেক্‌বখ্‌তী (সৌভাগ্য) লাভ করিতে পারে। বকরীর পরিবর্তে গরু যবাহ করিলে তাহাও জায়েয হইবে। সমাজের যাহারা ধনী ও বড়লোক, সমাজের গরীবদের প্রতি সর্বদাই তাহাদের সহানুভূতি থাকিতে হইবে, যাহাতে গরীবগণ ভাত-কাপড় বা খাওয়া-পরার কষ্ট না পায় এবং অভাবে পড়িয়া তাহাদের স্বভাব নষ্ট না হয়। এইজন্য প্রতি ক্ষেত্রেই গরীবদের কথা স্মরণ করিতে হইবে। তাহাদের স্বভাব-চরিত্র যাহাতে ভাল হয়, সেজন্য তাহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু গরীবই ধনীদের টাকার মুখাপেক্ষী নহে, ধনীরাও গরীবদের দো'আর মুখাপেক্ষী; উভয়ে উভয়ের মুখাপেক্ষী, কেহ কাহারো অপেক্ষা বড় বা অমুখাপেক্ষী (বেনিয়ায) নহে। এই সহানুভূতি সমাজের ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর মধ্যে জাগাইতে হইবে, যাহাতে ধনীদের মধ্যে অহঙ্কার না ঢুকে এবং গরীবদের মধ্যে প্রতিহিংসা এবং মনঃকষ্ট ও হীনতাবোধ না ঢুকে।

বিস্‌মিল্লাহ্ শুরু করা ও মক্তবে পাঠান

যখন শিশুর বয়স প্রায় ৫ বৎসর হইবে, তখন শিশুকে কোন নেক বুযুর্গ আলেমের দ্বারা দো'আ করাইয়া বিস্‌মিল্লাহ্ শুরু করাইয়া মক্তবে পাঠাইতে হইবে। মক্তবের মু'আল্লিমকে নেক, চরিত্রবান এবং শিশু মনস্তত্ত্বের জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হইতে হইবে। ৮/৯ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলে এবং মেয়ে এক সঙ্গে পড়িতে পারিবে। মক্তবের মু'আল্লিম শিশুদিগকে মিষ্ট ভাষায় মধুর ব্যবহারে এত আদর করিয়া সবক নিবেন ও দিবেন যেন শিশুরা বাড়ীতে থাকার চেয়ে মক্তবে আসিতে বেশী ভালবাসে। আদরে ও মিষ্ট ভাষায় যে কাজ হইবে, কঠোরতায় ও কর্কশ ভাষায় সে কাজ কখনও হইবে না। মক্তবে ওস্তাদ ছাহেব শুধু হরফ এবং হেজ্জে পড়া ও লেখাই শিক্ষা দিবেন না; বরং তাহাদিগকে আস্তে আস্তে আদব-আখলাকও শিক্ষা দিবেন। জরুরী জরুরী দো'আ কালাম শিক্ষা দিবেন এবং হাতে ধরিয়া ওযূ নামায, আদব-কায়দা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন। শিশুর পিতামাতা মক্তবের ওস্তাদকে অবহেলা করিবেন না; বরং প্রাণের সহিত ভালবাসিবেন এবং ভক্তি করিবেন। কারণ মা-বাপের ভক্তি দেখিয়া ছেলেও ওস্তাদকে-ভক্তি করিবে এবং আদব-কায়দা শিখিবে। ওস্তাদ-ভক্তি ব্যতিরেকে ছেলের 'এলম হয় না এবং ছেলের যেহেন খোলে না।' ওস্তাদ কখনও টাকার লোভী হইবেন না। তিনি বেশীর ভাগ খেয়াল এই দিকে রাখিবেন যাহাতে ছেলেটি মানুষ হইতে পারে। একটি মানব-সন্তানকে 'এবাদত বন্দেগী শিখাইয়া সুন্দর স্বভাব গঠন করিয়া মা-বাপ ও মুরুব্বিয়ানদের প্রতি আদব-তমীয শিক্ষা দিয়া মানুষ বানাইয়া দিতে পারিলে আখেরাতে আল্লাহ্‌র কাছে কত নেকী আর কত বড় দর্জা ও সম্মান পাওয়া যাইবে, ওস্তাদের সেই খেয়াল রাখাই বেশী উচিত।' দুনিয়ার টাকা পয়সার লোভ করা ভাল নহে; টাকা-পয়সার লোভ করিলে আলেমের কদর মর্যাদা থাকে না। মা-বাপ খেয়াল রাখিবে ওস্তাদের প্রতি এবং ওস্তাদ খেয়াল রাখিবে মা-বাপের প্রতি। মা-বাপের সম্মান ও আদব করা এবং তাঁহাদের খেদমত করা শিক্ষা দিবে ওস্তাদ। আর ওস্তাদের আদব করা ও তাঁহার খেদমত করা শিক্ষা দিবে মা-বাপ। এইরূপে মা-বাপ ও ওস্তাদ উভয়ে মিলিয়া শিশুর জীবন গঠন করিতে হইবে। ওস্তাদ দৈনিক শিশুর পিছনের সবক শুনিয়া ভালমত ইয়াদ করাইয়া তারপর সামনের সবক দিবেন; যাহাতে পিছনের পড়া ভুলিয়া না যায় বা ইয়াদ কাঁচা না থাকে, সেদিকে ওস্তাদকে খেয়াল রাখিতে হইবে। তিনি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাও শিক্ষা দিবেন। ছেলে প্রথমে অমিশ্র হরফ লিখিবে, তারপর মিশ্র হরফ লিখিবে। তারপর মানুষের নাম, জায়গার নাম ইত্যাদি লিখিবে, ইহার পর এবারত দেখিয়া লিখিবে, তারপর শুনিয়া লিখিবে। অতঃপর চিঠিপত্র, দলিল, দরখাস্ত প্রভৃতি লিখিবে তারপর তরজমা লিখিবে; ইহার পর রচনা লিখিবে। অতঃপর বিস্তারিতকে সংক্ষেপে এবং সংক্ষিপ্তকে বিস্তারিত করিয়া লিখিবে। সঙ্গে সঙ্গে হিসাব লেখা ও অঙ্ক কষা শিক্ষা করিবে।

শৈশবেই যদি শিশুকে আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে শেষে আর সন্তানের চরিত্র গঠন করা যায় না। কথায় বলে—"কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, শেষে করে ঠাস ঠাস," অর্থাৎ কচি বয়সে শিশুকে ধর্মোপদেশ শিক্ষা দিয়া অভ্যাসগত করাইয়া না দিলে শেষে আর ছেলেকে ভাল বানানো যায় না।

বিস্‌মিল্লাহ্ শুরু করাইতে সাধারণতঃ লোকে কিছু মিঠাই খাওয়ানের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। এইরূপে শিশু যখন কোরআন শরীফ শুরু করে বা কোরআন শরীফ খতম করে, তখনও ওস্তাদকে কিছু বখশিশ দেয় বা কিছু মিঠাই খাওয়ায়। এরূপ করা বেদআ'ত নহে; বরং এর দ্বারা কোরআনের তা'যীম করা হয় এবং ইহাতে ছেলের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা দরকার। ওস্তাদের উচিত লোভ না করা, শাগরিদের উচিত প্রাণপণে ওস্তাদের যথাসাধ্য খেদমত করা। ওস্তাদকে মাহিনার কর্মচারী মনে করা উচিত নয়। ওস্তাদকে অবশ্য অবশ্য অত্যন্ত ভক্তির পাত্র মনে করিতে হইবে। অন্যথায় কখনও এল্‌ম হাছিল হইবে না।

নামাযের অভ্যাস

ছেলে বা মেয়ের বয়স যখন ৭ বৎসর হইবে তখন হইতে ছেলেমেয়েদিগকে ভালবাসা দিয়া আদর পেয়ার করিয়া নামাযের অভ্যাস করাইতে হইবে। অত্যন্ত সুকৌশলে আদর-যত্ন করিবে, মহব্বত দেখাইয়া পুরস্কার দিয়া সুপরিবেশে রাখিয়া যেভাবেই হউক দশ বৎসরের মধ্যে ছেলেমেয়েদিগকে নামাযে অভ্যস্ত করাইতেই হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, সবচেয়ে বড় কৌশল এবং বড় হেকমত হইতেছে ছেলেমেয়েদেরকে সুপরিবেশে রাখা।

ছেলেমেয়েদের বয়স যখন ৯/১০ বৎসর হইবে, তখনই তাহাদের বিছানা পৃথক করিয়া দিতে হইবে। এমনকি, তখন নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকেও দুইজনকে এক বিছনায় শুইতে দিবে না। এ ছাড়া ৭/৮ বৎসরের হইলে বালক-বালিকাদিগকে একত্রে স্কুলে পড়িতে দিবে না। আর দশ বৎসর বয়সের ভিতর উপরোক্ত কৌশল সত্ত্বেও নামাযের অভ্যাস পাকা না হইয়া থাকিলে কিছু কঠোরতা করিয়া এমনকি প্রহার করিয়া বা শাস্তি দিয়া হইলেও নামাযের অভ্যাস করাইতে হইবে।

খাৎনা

ছেলের বয়স যখন ৭/৮ বা ৯/১০ বৎসর হইবে, তখন তাহার খাৎনা করাইতে হইবে। খাৎনা করা শুধু একটা প্রথা মাত্রই নয়, ইহা ইসলাম ধর্মের বড় একটি সুন্নত। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামের উপর আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ১০টি সুন্নত পালন করার জন্য ওহী আসিয়াছিল, যথা—

১। খাৎনা করান।
২। পেশাব-পায়খানা করার পর পানি দিয়া ধৌত করা।
৩। কুলি করিয়া মুখ পরিষ্কার করা।
৪। মিস্‌ওয়াক করিয়া দাঁত পরিষ্কার করা।
৫। নাকে পানি দিয়া, নাকের পশম বড় হইতে না দিয়া নাক পরিষ্কার রাখা।
৬। বগলের পশম বড় হইতে না দিয়া বগল পরিষ্কার রাখা।
৭। নাভির নীচে পশম হইলে তাহা মুণ্ডাইয়া (কামাইয়া) ফেলিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
৮। দাড়ি হইলে দাড়ি লম্বা করিয়া রাখা।
৯। মোচ কাটিয়া খাট করিয়া রাখা।
১০। হাত পায়ের নখ কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা।

খাৎনা করার সময় অনেকে অনেক রকম আড়ম্বর করিয়া থাকেঃ শরীঅতে উহার কোন হুকুম নাই। অনেকে রসম করার টাকা যোগাড় করিতে পারে না বলিয়া ছেলের বয়স অধিক হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও খাৎনা করায় না। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। শরীঅতে যেটাকে জরুরী সাব্যস্ত করিয়াছে, শুধু সেইটাকেই জরুরী মনে করা উচিত। শরীঅতের নির্দেশ ছাড়া অতিরিক্ত রসম পালন করার চাপ দেওয়াও অন্যায় এবং রসমের জন্য যে বয়সের যে কাজ সেই বয়েসে সেই কাজ না করিয়া ছেলের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া অন্যায়। মেয়ের খাৎনা করার প্রচলন আমাদের দেশে নাই বটে, কিন্তু মেয়ের খাৎনা করাও মুস্তাহাব। অবশ্য ছেলের খাৎনা করান সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। ছেলের খাৎনা করান ইসলাম ধর্মের একটি গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ। খৃষ্টান ধর্মে ও হিন্দুদের ধর্মে এই সুন্দর আদর্শ নাই।

১০/১১ বৎসর বয়স হইতেই ছেলেমেয়েদেরকে রমযানের রোযার কিছু কিছু অভ্যাস করান উচিত। এ সময়ে তাহাদিগকে শওক দেলাইতে হইবে এবং তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিতে হইবে; আদেশ বা কঠোরতা করিতে হইবে না। কঠোরতা তখনই করিতে হইবে, যখন বালেগ হওয়া সত্ত্বেও রোযা না রাখিবে। ৭ বৎসরের আগে যেরূপ নামাযের জন্য বলা চাই না, তদ্রূপ ১২ বৎসরের আগে রোযার জন্যও বলা চাই না। ১২ বৎসর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের পড়ার সময় আদায় করিয়া কিছু সময় (আছরের পরের সময়ে) দৌড়াদৌড়ি করিতে ও খেলিতে দেওয়া উচিত। তাহাদিগকে শুধু পড়ার মধ্যে না লাগাইয়া রাখিয়া কিছু কিছু কাজেরও অভ্যাস করান উচিত, যাহাতে মনে স্ফূর্তি থাকে এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

বালেগ হওয়া

ছেলের যখন স্বপ্নদোষ হয়, তখন সে বালেগ হয়। আর মেয়ের যখন ঋতু আসে, তখন সে বালেগা হয়। আর যদি বয়স ১৫ বৎসর হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও মেয়ের ঋতু না আসে বা ছেলের স্বপ্নদোষ না হয়, তবে চাঁদের হিসাবে জন্মদিবস হইতে যেদিন ১৫ বৎসর পূর্ণ হইয়া যাইবে, তার পরদিন হইতেই ছেলে বা মেয়েকে শরীঅতের হুকুমে বালেগ বলিয়া গণ্য করা হইবে। আর এই সময় হইতেই নামায, রোযা, ওযূ গোসল, রুযী-রোযগার ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্বই তাহাদের ঘাড়ে চাপিবে।

সংযমের অভ্যাস

যৌবনের প্রারম্ভের সময়টা বড়ই বিপজ্জনক। এই সময়ে রীতিমত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, যৌন-ক্ষুধা জাগিয়া অনেক মানুষকে বিপথগামী করিয়া ফেলে। একে ত ছেলেদের থাকে না অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয়তঃ শরমের দরুন তাহাকে উপদেশ দেওয়া বা শিক্ষা দেওয়ারও কেহ থাকে না। আর উপদেশ চাওয়ারও সাহস বা সুযোগও তাহার নিজের হয় না। অথচ যৌবনের যৌন-প্রেরণাকে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে, মানুষের জীবন সবদিক দিয়াই পঙ্গু হইয়া যায়। পাপের বোঝা মাথায় চাপে, স্বভাব নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য খারাব হয়, সম্পদও ধ্বংস হয়। কারণ, শরীরের বীর্যই মানবদেহের রাজা, ইহা হইতেই মানুষ সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক কিছু তৈয়ার করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, যে জিনিসকে সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণ মিলিয়াও সৃষ্টি করিতে পারেন না, ঐ

জিনিস যে জিনিস দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয়, তাহা কত মূল্যবান এবং কত দামী এবং সেই জিনিসকে নষ্ট বা অপচয় করা কত বড় মহাপাপ।

হাদীস শরীফে আছেঃ اَلشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْجُنُوْنِ ইহার মর্মার্থ এই যে, যৌবনের ঢেউ উন্মত্ততার ঢেউ সদৃশ। অতএব, এই ঢেউকে সুসংযত করিয়া রাখার জন্য এবং এই ঢেউয়ের মধ্য দিয়া জীবন তরীকে তরাইয়া নেওয়ার জন্য, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। প্রবীণ বয়স্ক কোন মুরব্বীর দ্বারা যৌবনে পদার্পণকারী বালকদিগকে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উপদেশ দেওয়া দরকার যে, এই বয়সে শরীরের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সুন্দর মেয়ে বা সুন্দর বালক দেখিতে ইচ্ছা হয়, বা তাহাদিগকে কাছে রাখিতে বা তাদের কথা শুনিতে মনে চায়। এমন কি নিজের শরীরের বিশিষ্ট অংগকে দেখিতে, স্পর্শ করিতে এবং হাত পা দিয়া ঘর্ষণ করিতে মন চায়—মনের এই চাহিদাগুলি সবই পাপ—বড় পাপ—এমন পাপ যে, তার আর 'তদারক' হইতে পারে না। এই প্রকার পাপের দ্বারা ভবিষ্যতে জীবন এমনভাবে নষ্ট হয় যে, জীবনে তাহার আর প্রতিকার হইতে পারে না। অতএব, মনের এই ধরনের চাহিদার সময় মনকে এবং দেহকে চাপিয়া, জোর জবরদস্তি করিয়া সংযত রাখিতেই হইবে। ইহাকেই বলা হয় সংযম অভ্যাস। যতবারই এইরূপ চাহিদা মনের ভিতরে জাগিবে, ততবারই সংযম অভ্যাসের দ্বারা মন ও দেহকে সংযত করিয়া রাখিবে এবং যথাসম্ভব কুসংসর্গ বর্জন করিবে। সাপের সংসর্গ গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তবুও কুসংসর্গ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ সাপের দ্বারা হয়ত মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবন ধ্বংস হয়। কিন্তু কুসংসর্গের দ্বারা মানুষের চিরস্থায়ী জীবন ধ্বংস হয়। আর মনে রাখিতে হইবে, এই রকম বালকদিগকে এক বিছানায় কিছুতেই শুইতে দেওয়া উচিত নয়। এমন কি নির্জন কামরাতেও তাহাদিগকে একত্রে থাকিতে দেওয়া চাই না। অপরকে নিজের গোপন শরীর দেখিতে বা স্পর্শ করিতে ত দেওয়াই চাই না; এমন কি নিজেও নিজের গুপ্তাঙ্গ বিনা ঠেকায় বা বিনা জরুরতে দেখা বা ছোয়া চাই না। অনেক সময় অনেক বদ লোকে এই ধরনের অশ্লীল কথা আলোচনা করে, অশ্লীল ও উলংগ ছবি রাখে ও দেখে, অশ্লীল প্রেমের নভেল-নাটক পড়ে এবং অশ্লীল ও নগ্ন ছবি প্রচার করে। খবরদার! খবরদার!! এই ধরনের অশ্লীল কাজ হইতে ছেলেমেয়েদিগকে অতি সতর্কতার সহিত দূরে রাখিতে হইবে। যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা ও এক সঙ্গে উঠা-বসা হলাহল বিষের চেয়েও অধিক জীবনহন্তা মনে করিবে। প্রথম প্রথম হয়ত টের পাওয়া যায় না বা ইহাতে কোন খারাব উদ্দেশ্যও থাকে না। কিন্তু অনভিজ্ঞতাবশতঃ একবার জড়াইয়া পড়িলে শেষে আর ছাড়ান যাইবে না, জীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

মেয়েদিগকে দশ বৎসরের পর বাড়ীর বাহিরে খেলাইতে বেড়াইতে দিবে না। খবরদার! খবরদার!! হিন্দুদের দেখাদেখি, ইংরেজদের দেখাদেখি, ধর্মহীনদের দেখাদেখি বা দুনিয়ার কোন প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া ঈমান নষ্ট করিবে না, ধর্ম নষ্ট করিবে না এবং ছেলেমেয়েদের জীবন বরবাদ করিবে না।

ছোট বয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া তত ভাল নয়। মেয়ের ১৪ বৎসরে এবং ছেলের ২০/২৫ বৎসরে বিবাহ দেওয়া ভাল কিন্তু ইহার পূর্বেও যদি কোন যৌন জরুরত উপস্থিত হয়, তবে বিবাহ করাইয়া দিবে। ঘটনাক্রমে ছেলে-মেয়ে উভয়ের মধ্যে যদি প্রেমের উদয় হইয়া বসে, তবে তাহাদের দুই জনেরও বিবাহ করাইয়া দেওয়া চাই। বিবাহের মধ্যে কোন কুপ্রথার

অনুসরণ করা চাই না। সরল ও সাদাসিধাভাবে, দায়িত্ব-জ্ঞান, ঈমানী শক্তি ও চরিত্রবান দেখিয়া বিবাহ করান উচিত।

মসজিদ

ইসলাম ধর্ম ব্যক্তিগত ধর্ম নয়, সমাজ ধর্ম। সমাজের সাফল্য নির্ভর করে মানুষের একতার ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, সেই শক্তির উপরে। একটি কঞ্চিকে সকলেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু পঞ্চাশটি কঞ্চির আঁটিকে কেহই ভাঙ্গিতে পারে না। একটি পাটের আঁশকে সকলেই ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু কতকগুলি আঁশ একত্র করিয়া যখন দড়ি পাকান হয়, সে দড়িকে কেহই ছিড়িতে পারে না। নির্জীব পদার্থের একতার মধ্যে যখন এত শক্তি, তখন আশ্‌রাফুল মাখলুকাত—সমস্ত জীবের সেরা মানুষের যদি একতা হয়, তবে তাহাদের শক্তি যে কতগুণ বাড়িয়া যায়, তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তখন তাহাদিগকে অবনত করিতে পারে এমন শক্তি কাহারো থাকে না; বিশেষতঃ ঈমানদার লোকের একতাবদ্ধ জমা'আতের যখন সৃষ্টি হয়, তখন তাহাদের প্রতি নাযেল হয় আল্লাহ্‌র রহ্‌মত। এই জন্যই আমাদের ইসলাম ধর্মে মসজিদে একত্র হইয়া শৃঙ্খলার সহিত একতাবদ্ধভাবে একজন ইমামের তাবেদারী করিয়া দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার হুকুম হইয়াছে। এই জন্যই যেখানে মুসলমানদের বসতি থাকিবে, সেইখানেই প্রতি মহল্লায় মহল্লায়—পল্লীতে পল্লীতে মসজিদ থাকিতেই হইবে। মসজিদকে কেন্দ্র করিয়াই হইবে মুসলমান সমাজের সংগঠন। ইহা শুধু Tradition বা সংস্কার নয়; ইহা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রবর্তিত উত্তম আদর্শ। মহল্লার প্রতিটি লোকের যোগাযোগ থাকে মসজিদের সঙ্গে এবং দায়িত্ব থাকে মসজিদের প্রতি। মসজিদের একজন ইমাম থাকেন এবং একজন মুআয্‌যিন থাকেন। ইমাম ও মুআয্‌যিনের খেদমত করা এবং চেরাগ-বাতি বিছানা বা পানির ব্যবস্থা করা মহল্লাবাসীদেরই কর্তব্য। প্রত্যেকেরই কিছু কিছু করিয়া মসজিদের সাহায্য করিতে হইবে।

মক্তব

মসজিদের দ্বারাই মক্তবের কাজ চলে। ইসলামের বুনিয়াদী তা'লীম—প্রাথমিক শিক্ষা মক্তবেই হয়। আল্লাহ্‌কে চেনা, রাসূলকে চেনা এবং কিসে আল্লাহ্ পরকালে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং কিসে অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহা জানা প্রত্যেকটি মানুষের উপরই ফরয। এই শিক্ষার প্রাথমিক সূচনা হয় মক্তবে। অতএব, মক্তব মুসলমানদের জন্য কতদূর জরুরী তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

মক্তবের ওস্তাদজীর দায়িত্ব এবং মর্তবা যে কত অধিক, তাহা ইহার দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে যে, মানুষ জীবনভর যাহাকিছু কলেমা, নামায, রোযা প্রভৃতি করিবে, তাহার সবকিছুরই গোড়াপত্তনকারী হইতেছে মক্তবের এই ওস্তাদজী। অতএব, তিনি সকলের সমস্ত এবাদত বন্দেগীর সমপরিমাণ সওয়াব পাইবেন। সুতরাং সকলের ঊর্ধ্বে তাঁহার মর্তবা হইবে। কাজেই সকলের উচিত, মক্তবের ওস্তাদজীর এবং মসজিদের ইমাম ও মুআয্‌যিনের তা'যীম ও সম্মান করা। ইমাম ও মুআয্‌যিনের সম্মান এইজন্য করিতে হইবে যে, মুআয্‌যিন সবাইকে আল্লাহ্‌র দরবারের দিকে ডাকিয়া আনেন এবং ইমাম ছাহেব সকলকে আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছাইয়া তাহাদের আরযী (দরখাস্ত) পেশ করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পবিত্র দরবারের আদব-কায়দা ও নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন।

মাদ্রাসা

আল্লাহ্‌কে চেনা, আল্লাহ্‌র রাসূলকে চেনা, আখেরাতের নেকী-বদীর হিসাবের কথা জানা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিষয়সমূহ জানা প্রত্যেক মানুষের উপরই সর্বপ্রধান ফরয। এইসব বিষয়ের, মূল বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে কোরআন শরীফে এবং হাদীস শরীফে। তথা হইতেই বড় বড় আলেমগণ কিছু কিছু বিভিন্ন ভাষায় লিখিয়া থাকেন বা বর্ণনা করিয়া থাকেন। আজকাল সকলেই নিজ চোখে দেখিতে চায়, অন্যের কথায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে চায় না। কাজেই কোরআন হাদীসের এলম হাছিল করা সকলের উপর ফরয। কোরআন হাদীসের ভাষা আরবী, আল্লাহ্‌র ভাষা আরবী, বেহেশ্‌তবাসীদের ভাষা হইবে আরবী, নামাযের ভাষা আরবী, কাজেই সকলেরই আরবী ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। আরবী ভাষা না শিখিয়া শুধু অনুবাদ পড়িলে তাহাতে অনুবাদকের কথাই পড়া হয়; আল্লাহ্‌র বাণী পড়া হয় না। অবশ্য অনুবাদক যদি বিশ্বস্ত ও খোদাভীরু হন, তবে তাহার মুখে আল্লাহ্‌র বাণী কিছু বুঝিতে পারিয়া কিছু তৃপ্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরিপূর্ণ তৃপ্তি কখনো হইতে পারে না। আর অনুবাদক যদি খোদাভীরু বা খোদাভক্ত না হয় বা কোরআনের ভাষায় যদি তার পূর্ণ দক্ষতা না থাকে বা ইসলামের প্রতি শত্রুতাবশতঃ যদি সে কোরআন শরীফের অর্থ বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে অথবা টাকার লোভে বা অন্য কোন হীন উদ্দেশ্যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে সে অনুবাদ পড়িয়া কিছুতেই আল্লহ্‌র কথা পাওয়া যাইবে না। এজন্য মুসলমানের আল্লাহ্‌র কোরআনের ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা জন্মাইতেই হইবে। নতুবা জাতি ধর্ম সবকিছুই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

কোরআনের ভাষায় দক্ষতা জন্মাইবার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানদের উপর ফরয এবং মাদ্রাসা পরিচালনার খরচ বহন করাও মুসলমানদের উপর ফরয। হুকুমৎ ইহাতে সহায়তা না করিলেও মুসলমানদের উপর ইহা ফরয থাকিবেই থাকিবে। ফলকথা এই যে, ধর্ম রক্ষার খাতিরে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসার দরকার আছেই আছে। ইহা কোন রসম নয় বা কোন গোঁড়ামিও নয়; বরং ইহা আল্লাহ্‌র কোরআন রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী দ্বীনের খেদমত। যেহেতু ইসলামের শত্রুদের দ্বারা আমাদের সমাজ বহুকাল যাবৎ শাসিত ও পরিচালিত হইয়াছে এবং তাহার প্রভাবে অনেকেই মসজিদের মুআয্‌যিনকে আলেমকে বা তালেবে এলমকে তাঁহাদের যোগ্য মর্যাদা দেয় না; বরং অনেকেই তাঁহাদের নিজেদের দুর্ভাগ্য টানিয়া আনার জন্য তাঁহাদিগকে অনেক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, তাঁহাদিগকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাকে। এইসব অত্যন্ত জঘন্য পাপ। এহেন পাপের মধ্য দিয়া একজন আলেম বা তালেবে এলমের মনে আঘাত দিলে হয়ত তাহার কারণে দেশকে-দেশ তাবাহ ও বরবাদ হইয়া ধ্বংসে পতিত হইতে পারে। হযরত মাওলানা থানভী চিশ্‌তী (রঃ) অধিকাংশ সময়ে সমাজের লোকদের ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহাদিগকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে এ বয়াতটি নছীহত স্বরূপ পড়িতেন—

مبیں حقیر گدایان عشق راکیں قوم شاهان بے کمر و خسروان بے کلاه اند

ইহার মমার্থ এইঃ হে মুসলমানগণ! এই ইমাম মুআয্যিনগণ এই আলেম ও তালেবে এলেমগণ যদিও তাহারা দেখিতে গরীব, কিন্তু হাকীকতে তাহারা আল্লাহ্‌র আশেক। অতএব, খবরদার! খবরদার! তোমরা তাহাদিগকে কখনও হাকীর (তুচ্ছ) মনে করিও না। কেননা, যদিও তাহাদের কাছে তাজ ও তখত নাই, বিল্‌ডিং বা ফার্নিচার নাই; কিন্তু যেহেতু তাহারা আল্লাহ্‌র আশেক, কাজেই তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহ্। অতএব, সাবধান! আল্লাহ্‌র ব্যথিতদের মনে তোমরা কোনরূপ ব্যথা দিও না; দিলে তোমাদের আর খায়ের নাই; তোমরা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

নেক লোকদিগকে তাহাদের দারিদ্র্যের দরুন তুচ্ছ করার চেয়ে জঘন্য পাপ আর কিছুই হইতে পারে না। আজকাল অনেকেই খেয়াল না করিয়া এইরূপ পাপে ডুবিয়া ধ্বংস হয়, সেই জন্য দেলের দরদে এই কথা কয়টি সমাজের উপকারার্থে লিখিলাম।

দাড়ি রাখা ও মোচ খাট করা

বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীঅতের যাবতীয় দায়িত্ব আসিয়া ঘাড়ে চাপে। এতদিন বাপে খাওয়াইয়াছে, বাপে টাকা দিয়াছে; এখন আর বাপের কাছে চাওয়া উচিত নয়। বাপের কাছে এখন চাহিতেও লজ্জাবোধ করা উচিত। বাপ যদি এখনো দেয়, তবে সে তাহার অনুগ্রহ, তাহার মেহেরবানী। এ অবস্থায় তাহার শোকর আদায় করা উচিত। কিন্তু তাহার নিকট কোনরূপ দাবী চলিবে না; বরং এখন বাপকে কামাই রোজগার করিয়া খাওয়ান উচিত। অবশ্য এই রোজগারের সময়ে যাবতীয় পাপ পথ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

যৌবনের সংগে সংগে মুখে দাড়ি দেখা দিলে, কুসংসর্গের প্রভাবে ও পরানুকরণের দুর্বলতার কারণে, দাড়ি ফেলিয়া দিতে মনে চাহিবে; কিন্তু এ সময় মনে রাখিবে, যে লোক রাসূলের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কুসংসর্গের তাবে'দারী করিবে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মনে ব্যথা দিয়া বিজাতির অনুসরণ করিবে, তাহার স্থান পরকালে কোথায় হইবে, উহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে। ইহা কখনো মনে করিবে না যে, ইহা মোল্লা-মৌলবীদের মনগড়া কথা; বরং ইহা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) -এর অলংঘনীয় আদেশ যে, اوفوا اللحى واحفوا الشوارب অর্থাৎ, (হে মুসলমানগণ! খবরদার! তোমরা দাড়ি লম্বা করিয়া রাখ এবং মোচ খাট করিয়া ফেল।

রাসূলের এই আদেশটি যে কত বড় উপকারী এবং কত প্রয়োজনীয় তাহা আখেরাতে ত বুঝিবেই, আর দুনিয়াতে যখন জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইবে, তখনও বুঝিবে।

অনেকে বিজাতীয় অনুকরণে বগলের পশম লম্বা করিয়া রাখে। নাভির নীচের পশম ছাফ করে না—ইহা অতি জঘন্য রকমের কুঅভ্যাস এবং অতি ঘৃণিত ধরনের পাপ। বিজাতীয় অনুকরণের ন্যায় হীনতা-নীচতা আর নাই। জাতির গৌরববোধ যাহাদের নাই, তাহারা অতি নির্লজ্জ মানুষ। মনুষ্য সমাজে তাহারা স্থান পাওয়ার যোগ্য নহে।

অনেক সময় বিধর্মীদের অনুকরণে পুরুষ লোক মাথার চুল পিছনের দিকে কামাইয়া বা ছোট করিয়া সামনের দিকে লম্বা করিয়া রাখে, মেয়েদের মাথার চুলও কাটিয়া খাট করিয়া রাখে—ইহা একদিকে আখেরাতের বিচারে পাপ, তেমনি দুনিয়ার ইজ্জতের দিক দিয়াও খুবই ঘৃণিত কাজ। কেননা, ইহাতে বিধর্মীরা মনে করিবে যে, এই হতভাগাদের নিজেদের কোন আদর্শ নাই—এরা

আমাদেরই অনুসারী বা তাবেদার, আমাদেরই পদলেহনকারী। ইহা কতখানি ঘৃণার কথা, কতখানি লজ্জার বিষয়!

লেবাস-পোশাক

লেবাস-পোশাক সম্বন্ধে আমাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটি আদর্শ আছে। মুসলমান পুরুষের আদর্শ পোশাক হইতেছেঃ নিম্ন শরীরের জন্য—প্রাইভেট জীবনে এবং সাধারণ লোকের জন্য লুঙ্গি। আর তাহাদের সামাজিক জীবনে এবং উচ্চস্তরের জন্য পায়জামা (পায়ের গিরা না ঢাকে এইরূপে)। খৃষ্টানদের আদর্শ হইতেছেঃ প্যান্ট, ফুল প্যান্ট বা হাফ প্যান্ট। আর হিন্দুদের আদর্শ হইতেছেঃ ধুতি। ঊর্ধ্ব শরীরের জন্য মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ পোশাক হইতেছেঃ প্রাইভেট জীবনে এবং সাধারণ লোকের জন্য কোর্তা, পিরহান বা পাঞ্জাবী এবং তাহাদের সামাজিক জীবনে ও উচ্চস্তরের জন্য আচ্‌কান শিরওয়ানী এবং আরো উচ্চস্তরের জন্য আবা, চোগা, মেশলাহ্ প্রভৃতি। ইংরেজ বা খৃষ্টানদের আদর্শ পোশাক, কোট শার্ট। আর হিন্দুদের আদর্শ পোশাক হয়ত নাই বা ধুতির খুট। আর মাথার জন্য—মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ টুপী ও পাগড়ী। (বিনা প্রয়োজনে গলায় কিছু না।) খৃষ্টানদের জাতীয় আদর্শ হ্যাট; আর তাহাদের ধর্মীয় আদর্শ গলায় ধর্মীয় প্রতীক ক্রুশ চিহ্ন স্বরূপ নেকটাই পরা এবং হিন্দুদের আদর্শ খোলা মাথা। মুসলিম মহিলাদের আদর্শ পোশাক—নিম্ন শরীরের জন্য—পায়ের পাতা ঢাকে এরূপ পায়জামা, ঊর্ধ্ব শরীরের জন্য লম্বা আস্তিনের লম্বা ঝুলের কোর্তা এবং বুক উঁচু না দেখায় তার জন্য বুক-বন্ধনী আর মাথার জন্য মুখঢাকা ঘোমটাসহ চাদর। হিন্দু মহিলাদের পোশাক—ধুতি বা শাড়ী, শাড়ীর একপাশ দ্বারা মাথা ঢাকা। খৃষ্টান বা ইংরেজ মহিলাদের—মাথা খোলা, বুক খোলা, মুখ খোলা ও হাঁটুর নীচে খোলা গাউন। (নীচে কি তাহা আমি জানি না, তবে সম্ভবতঃ আণ্ডার-ওয়ার জাতীয় কিছু।)

ইসলাম ধর্ম যেহেতু আল্লাহ্ মনোনীত ধর্ম মানুষের কোন মনগড়া ধর্ম নয়, সেইজন্য ইহাতে যেমন খোদার বন্দেগীর ব্যবস্থা আছে, যেমনি ইহাতে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিধি ব্যবস্থা, লেবাস-পোশাকের ব্যবস্থা, খাদ্য খোরাকের ব্যবস্থা, বাসস্থানের ব্যবস্থা, এক কথায়—সব ব্যবস্থাই আছে। সুতরাং যেক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বাধীন একটি ব্যবস্থা আছে, সেক্ষেত্রে যদি কেহ নিজের জাতীয় আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বিজাতীয় আদর্শ গ্রহণ করে, তবে তাহাকে যে জাতিচ্যুত বলা যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বাহ্নেই আমাদিগকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, من تشبه بقوم فهو منهم ইহার মর্ম এই যে, যদি কেহ অন্য কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিয়া তাহাদের লেবাস-পোশাক এবং ছুরত-সীরত অবলম্বন করে, তবে তাহাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সেই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। উপরের হাদীসটি কোরআনের এই আয়াতেরই প্রতিধ্বনি করিতেছেঃ

وَلَاتَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ○

ইহার মর্মার্থ এই যে, হে মুসলমানগণ! যাহারা যালেম, কাফের, আল্লাহ্‌কে চিনে না, রাসূলকে মানে না, তাহাদের দিকে তোমরা ঝুঁকিও না। অর্থাৎ, যাবতীয় লেবাস-পোশাক ছুরত-সীরতের ব্যাপারে খাদ্য-খোরাক বা বিলাস-ব্যাসনের ব্যাপারে তোমরা তাহাদের অনুকরণ করিও না। যদি

তোমরা তদ্রূপ কর, তবে তোমাদিগকে দুনিয়া এবং আখেরাতে আগুন স্পর্শ করিবে; অর্থাৎ আখেরাতে দোযখের আযাব ও দুনিয়ায় লাঞ্ছনার আযাব ভোগ করিতে হইবে। কোরআন শরীফে আরও আছেঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ○ سورة النساء

ইহার মর্মার্থ এই যে, রাসূলের তরীক্বা, রাসূলের হেদায়ত এবং রাসূলের আদর্শ পরিষ্কার প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও যাহারা উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে এবং মু'মিন মুসলিমগণের জীবনধারাকে ছাড়িয়া অন্যরূপ জীবনধারা গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে (দুনিয়ার জীবনে) আমি তাহা করিতে দিব। জোর করিয়া বলপূর্বক ফিরাইয়া রাখিব না। কিন্তু পরিণামে পরকালে আমি তাহাদিগকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে স্থান দান করিব,—জানিয়া রাখিও জাহান্নাম অত্যন্ত খারাব স্থান। সুতরাং কোন মুসলিম নর-নারীর বা বালক-বালিকার লেবাসে-পোশাকে, ছুরতে-সীরতে খাদ্য-খাদকে কখনও বিজাতীয় অনুকরণ করা চাই না। কারণ, মানব জাতি যাবৎ তাহাদের জাতীয় গৌরব বোধকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া মানবতার স্তর হইতে ইতর প্রাণীর স্তরে নামিয়া না যায়, তাবৎ তাহারা নিজেদের জাতীয় আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য জাতির আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে না।

—সূরা-নেছা, রুকূ ৭

পরানুকরণ দূষণীয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নীত যদি অন্য কোন জাতি করে, তবে সে উন্নতির পথ আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না। এ সম্পর্কে হযতর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেনঃ

كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا ـ

'জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা মুমিনদের জন্য হারানিধি স্বরূপ। অতএব, জ্ঞানের কথা যেখানেই পাওয়া যাউক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা মুমিনেরই হক এবং মুমিনেরই হারান ধন।'

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন, প্রতি ক্ষেত্রেই দেখিবেনঃ মুসলিম জাতির পোশাক মানুষের ভিতরে গাম্ভীর্য, চিন্তাশীলতা ও আত্মসম্মান বোধের চেতনা জাগ্রত করে, পক্ষান্তরে অন্যান্য খাট, অর্ধ বা উলঙ্গ পোশাক মানুষকে উলঙ্গই রাখে, এমন পোশাক মানুষের মধ্যে ছেলেমী, বাচালতা ইত্যাদি ভাব আনয়ন কবে।

হাফপ্যান্ট

হাফপ্যান্ট পরার মধ্যে পরানুকরণ ছাড়া আরও খারাবী এই যে, হাফপ্যান্ট পরা আমাদের দেশের গামছা পররা মত। হাফপ্যান্ট পরিলে ফরয তরক হইয়া যায়। কারণ, ছতর ঢাকা ফরয। পুরুষের ছতর হইতেছে নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত। অতএব, যদি কাজের সময়ের জন্য হাঁটু ঢাকার মত ছোট পায়জামা তৈয়ার করিয়া পরা হয়, তবে গামছা পরা ও হাফপ্যান্ট পরার ফরয তরকের পাপ হইতে বাঁচা যায়।

নেক্‌টাই

নেক্‌টাই-এর মধ্যে পরানুকরণ ছাড়া আরও খারাবী এই যে, নেক্‌টাই-এর গিরা বাঁধাটা খৃষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক। তাহারা বলে যে, যীশুখৃষ্টকে শূলীতে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। যেহেতু তাহাদের মিথ্যা মতে তিনি জগতের সব পাপ হরণ করিয়া নিজের জীবনকে শূলীবিদ্ধ করিয়া, কোরবান করিয়া সমস্ত মানুষের পাপ দূর করিয়া গিয়াছেন, কাজেই খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী যে কেহই হইবে, তাহার সেই শূলীকাষ্ঠের চিহ্ন সর্বদা গলায় ধারণ করিতে হইবে। এইজন্য খৃষ্টানরা শূলীকাষ্ঠের চিহ্নস্বরূপ নেকটাই ব্যবহার করিয়া থাকে। সুরাং নেকটাই ধারণ করা কোন মুসলমানের কিছুতেই উচিত নহে। কারণ, মুসলমানের দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ্‌কে সজ্‌দা করিতে হয়—মিথ্যার প্রতীক গলায় ঝুলাইয়া সত্য খোদার দরবারে যাওয়া সাজে কি? যাহারা পরানুকরণের ন্যায় নীচাশয়তা ভিতরে রাখে, তাহাদের দ্বারা জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা যায় কি?

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ইহুদী এবং খৃষ্টান, এই দুইট জাতিই ছিল তৎকালীন প্রধান জাতি। কিন্তু এই উভয় জাতিই সাংসারিক ব্যাপারে নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়; বরং স্বর্গীয় ধর্মীয় ব্যাপারে দারুণ মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। ইহুদীরা সত্যকে মিথ্যা করিয়া রাখিয়াছিল। হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র অতি মর্যাদাশালী সত্য পয়গম্বর। কিন্তু ইহুদী পাপিষ্ঠরা এহেন সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করিয়া হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলিত, হারামের পয়দায়েশ। (নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক।) কোরআন এহেন মিথ্যাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য বারবার ঘোষণা দিয়াছেঃ 'ঈসা পবিত্র, ঈসার জন্ম পবিত্র, ঈসার মৃত্যু পবিত্র।' দ্বিতীয় দিকে খৃষ্টানরা অতি ভক্তিতে মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা শুধু যে, ধর্মের ব্যাপারে এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল তাহাই নহে, অধিকন্তু তাহারা সারা দুনিয়াতে পাপের ও যুল্‌মের তাণ্ডবলীলা চালাইবার জন্য জঘন্যতম মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিল যে, 'ঈসা খোদার বেটা। খোদার বেটা শূলীকাষ্ঠে ঝুলিয়া নিজের জীবন কোরবান দিয়া সমস্ত দুনিয়াবাসীদের পাপ মোচন করিয়া গিয়াছেন। কাজেই এখন লোকে যতই পাপ, যতই যুল্‌ম করুক না কেন, তাহাতে তাহার কোনই ক্ষতি হইবে না। এই দুইটি মিথ্যা এত বড় মিথ্যা যে, এক দিকে ইহাতে আল্লাহ্‌র তাওহীদ (একত্ববাদ) নষ্ট হইতেছে, অন্য দিকে দুনিয়াতে পাপ এবং অনাচারের তাণ্ডবলীলা চালাইবার সুযোগ হইয়াছে। খৃষ্টানদের এই রকম জঘন্য মিথ্যার প্রতীক হইতেছে 'ক্রুশ-টাই' অর্থাৎ 'নেক্‌টাই'। সেন্টপলের এই সৃজিত জঘন্য ইতিহাসকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বারবার ঘোষণা দিয়াছেঃ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ الاية "তাহারা (ইহুদীরা) তাঁহাকে (ঈসাকে) বধও করিতে পারে নাই, শূলীতেও চড়াইতে পারে নাই।"

—সূরা নেছা, রুকূ-৩

সুতরাং যাহারা নেকটাই পরে, তাহারা যেন কোরআনকে মিথ্যা বলিতেছে এবং জঘন্য মিথ্যা ইতিহাসকে সত্য বলিতেছে। (নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক।)

ফুলপ্যান্ট

ফুলপ্যান্টের মধ্যে পরানুকরণ ভিন্ন আরও খারাবী এই যে, ইহাতে সাধারণতঃ পায়ের গোড়ালীর গিরা ঢাকিয়া যায়। অথচ এই গিরা ঢাকিয়া পুরুষের কোন কাপড় পরা হারাম। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের দৈনিক পাঁচবার নামায পড়িতে হয়; কিন্তু ফুলপ্যান্ট পরিয়া নামায পড়ার বিশেষ অসুবিধার কারণে এবং নামাযে উঠা-বসায় উহার ভাঁজ ভাংগিয়া যায় বলিয়া অনেকে নামাযী হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে নামায পড়ে না; পরে ক্বাযা করিয়া লয়। ইহা কত বড় দুঃখের বিষয়! উপরন্তু পায়জামা পরিয়া যেমন আরাম পাওয়া যায়, ফুলপ্যান্টে সেরূপ আরাম পাওয়া যায় না।

নারীর মাথার চুল কাটা

দোররোল মোখ্‌তার কিতাবে আছেঃ ○ قَطَعَتْ شَعْرَ رَأْسِهَا اَثِمَتْ وَلُعِنَتْ

অর্থাৎ, "কোন নারী যদি তাহার মাথার চুল কাটে, তবে সে পাপিনী হইবে এবং অভিশপ্তা হইবে।"

ফতওয়া বাযযাযিয়া কিতাবে আছেঃ

وَاِنْ بِاِذْنِ الزَّوْجِ لِاَنَّهٗ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَلِذَا يُحْرَمُ قَطْعُ لِحْيَتِهٖ ـ

ইহার মর্মার্থ এই যে, নারী যদি তাহার স্বামীর অনুমতি বা আদেশক্রমেও মাথার চুল কাটে, তথাপি সে পাপিনী ও অভিশপ্তা হইবে। কেননা, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করিয়া কোন মানুষের (চাই সে স্বামীই হউক বা রাষ্ট্রনায়ক হউক) আদেশ, অনুমতি পালন করা যাইতে পারে না। এই জন্যই স্বয়ং স্বামীর পক্ষেও তাহার দাড়ি কাটা হারাম।

নারীর মাথার চুল কাটার মধ্যে দুইটি পাপ রহিয়াছে। প্রথমটি হইতেছে নারীর জন্য নরের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম। হাদীস শরীফে এই সাদৃশ্য অবলম্বনের জন্য অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ـ

(ترمذى ابو داؤد ابن ماجة و مسند امام احمد)

অর্থাৎ 'যে নারী লেবাস-পোশাকের দ্বারা বা চুল দাড়ি দ্বারা নরের রূপ আকৃতি ধারণ করিবে, তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ পতিত হইবে; এবং যে পুরুষ লেবাস-পোশাকের দ্বারা বা চুল দ্বারা নারীর রূপ আকৃতি ধারণ করিবে তাহাদের উপরও আল্লাহ্‌র অভিশাপ পতিত হইবে।'

আর দ্বিতীয় পাপ হইতেছে বিজাতীয় সাদৃশ্যতা গ্রহণ করা। নরনারী নির্বিশেষে যে কোন মুসলমানের পক্ষেই বিজাতীয় অনুকরণ করা হারাম। এ সম্বন্ধে হাদীস এবং কোরআন শরীফের আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সাদৃশ্যতা' শব্দের মূল আরবী হইতেছে 'তাশাব্বুহ' (تشبه) [সাদৃশ্যতা শব্দটি আমি ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু এই শব্দটি সম্পূর্ণরূপে আমার মনঃপুত হইতেছে না। কেননা, শব্দটি সাধারণভাবে প্রচলিত হইলেও ব্যাকরণ অনুসারে ইহা ভুল। দ্বিতীয়তঃ এই শব্দের দ্বারা মূল تشبه শব্দের পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশ পায় না। এজন্য تشبه শব্দের পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়া পরে আমি 'সাদৃশ্যের' পরিবর্তে تشبه শব্দই ব্যবহার করিব] হাদীসে تشبه -ই আছে, تشابه নহে। تشبه -এর অর্থ অনুরূপ হওয়া (চাই অনিচ্ছাকৃতভাবেই হউক)। আর تشبه অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ দৃশ্য গ্রহণ করা। ইহার অর্থ—"অনুকরণ করা" ও করা যায় না। কারণ যে সব জিনিস দৃশ্য নয় যেমন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি, তাহাতে অনুকরণ হারাম নহে। শুধু যেটা দেখা যায় দৃশ্য হয়, যেমন বাহিরের পোশাক, চুল, দাড়ি, উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা প্রভৃতির নিয়মপদ্ধতি এই জাতীয় সমস্তের উপরই تشابه শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। যেটা দেখা যায় না, সেটার উপর প্রয়োগ হইতে পারে না।

কেহ যদি তাশাব্বুহ করার এরাদা না করিয়া শুধু নিজের আরামের জন্য, নিজের নফ্‌সের খাহেশের জন্য করিয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে, তাহার এইরূপ খাহেশ কেন হইতেছে? —অন্যের দেখাদেখিই ত হইতেছে? কাজেই গুপ্ত অনুকরণেচ্ছা নিশ্চয়ই আছে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অনুকরণেচ্ছাকে রদ করিয়া দিয়া শুধু নিজের আরাম বা দরকারবশতঃ করে, তবুও দেখিতে হইবে যে, ঈমানের মূল ভিত্তি হইতেছে আল্লাহ্ ও রাসূলের অর্থাৎ কোরআন হাদীস, ফরয-ওয়াজিব, সুন্নত, মাদ্রাসা-মসজিদ প্রভৃতির মহব্বতের উপর। আর মহব্বত কাহারও প্রতি প্রমাণিতই হইতে পারে না—যে পর্যন্ত মহব্বতের বিপরীত বস্তু (অর্থাৎ, শত্রুতা) তাহার শত্রুর সঙ্গে প্রমাণিত না হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি, কোরআন হাদীসের প্রতি, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতের প্রতি বা মাদ্রাসা-মসজিদের প্রতি যাহারা ঘৃণা, বিরক্তি বা শত্রুতা পোষণ করে, তাহাদের প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতার ভাব পোষণ না করিলে, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি মহব্বতের দাবীর কোন অর্থই হয় না। সুতরাং দরকারবশতঃ বা আরামের জন্য যদিও কোন জিনিস তাহাদের অনুরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তবুও হয় জিনিসকে কিছু অন্যরূপ করিয়া লইতে হইবে, না হয় বিরক্তি বা অনিচ্ছার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা ঈমানের হানি হইবে।

পুরুষের দাড়ি কাটা

আজকাল নব্য যুবকদের মধ্যে প্রথা হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও দাড়ি রাখে না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য প্রথা এবং সাংঘাতিক পাপ। দাড়ি না রাখার মধ্যে নিম্নরূপ অনেকগুলি পাপ একত্র হয়;—(১) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া যত নবী বা যত ওলী অতীত হইয়াছেন, সকলেই দাড়ি রাখিয়াছেন। দাড়ি না রাখিলে সেই আদি সুন্নত (নবীদের আদর্শ) তরক হইয়া যায়। (২) স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আদর্শঃ

اوفوا اللحى واحفوا الشوارب

"তোমাদের দাড়ি লম্বা করিয়া রাখ এবং মোচকে খাট কর।"

যে প্রাণপ্রিয় রাসূলের 'শাফাআত' ছাড়া কাহারও বেহেশ্‌তে যাওয়ার সাধ্য নাই, তাঁহার আদর্শের উপর ছুরি, কাঁচি চালাইলে তাঁহার মনে ব্যথা লাগে না কি? এইরূপ নবীর মনে ব্যথা দিয়া আমরা তাঁহার শাফাআতের আশা করিতে পারি কি? চিন্তা করুন, আমাদের নবী আমাদিগকে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে গঠন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই আদর্শ ছাড়িয়া হীনমন্যতার

পরিচয় দিয়া অন্য জাতির আদর্শ গ্রহণ করিলে আমাদের ইহ-পরকাল ভাল হওয়ার আশা করা যাইবে কি? মনে রাখিবেন, একদিন তাঁহার দরবারে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

পুরুষের মাথা খোলা রাখা

পুরুষের মাথায় টুপি রাখা এবং আরও একটু উন্নত পর্যায়ের হইলে টুপির সঙ্গে রুমাল বা পাগড়ী রাখা ইসলামী তরীকাহ।

হিন্দুদের প্রথা ছিল মজলিসে খোলা মাথা থাকা আর ইংরেজদের প্রথা ছিল হ্যাট মাথায় দেওয়া; কিন্তু আজকাল প্রায় সকলেই মাথা খোলা রাখে। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা কোন সভ্যতা নয়; বরং একটা বড় রকমের অসভ্যতা। অতএব, বিজাতির অনুকরণ না করিয়া মুসলমান ছেলে-দের পক্ষে নিজেদের জাতীয় আদর্শ পালন করাই দরকার। টুপি মাথায় রাখা একান্ত অপরিহার্য।

নারীদের মাথা খোলা রাখা

নারীদের মাথা চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখা ইসলামের নির্দেশ। তাহাদের মাথা খোলা রাখা জঘন্য রকমের পাপ। কারণ, তাহাদের মাথার চুল খোলা দেখিলে, যুবকদের মনে যৌন উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নারীর মাথার চুলও ছতরের মধ্যে গণ্য। ছতর খোলা রাখিলে যে পাপ হয়, চুল খোলা রাখিলেও তদনুরূপ পাপ হইবে।

শাড়ী

শাড়ী পরা নারীদের জন্য সুন্নতের বরখেলাফ। কারণ, হযরত নবী আলাইহিস্‌সালামের বিবিগণ এবং কন্যাগণ—যেমন আমাদের মা ফাতেমা, মা আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ কখনও শাড়ী পরেন নাই। তাঁহাদের লেবাস ছিল মাথায় উড়নী, গায়ে লম্বা আস্তিনের ও লম্বা ঝুলের জামা বা কোর্তা আর পরনে পায়ের পাতা ঢাকা পায়জামা বা ছায়া। এতদ্ভিন্ন হযতর নবী আলাইহিস্‌সালাম আদেশ করিয়াছেনঃ خَالِفُوا الْمَجُوْسَ وَالْمُشْرِكِيْنَ (হে মুসলমানগণ! তোমরা অগ্নিপূজকদের এবং মূর্তিপূজকদের অনুরূপ লেবাস পরিধান করিও না এবং শরীরের দৃশ্যকে তদ্রূপ বানাইও না—বরং তাহাদের বিপরীত করিও।'

গাউন পরিলেও মেয়েদের পায়ের নিম্নদিক খোলা থাকে। অথচ মেয়েদের পায়ের নীচের দিকেও খোলা রাখা জায়েয নহে। মেয়েদের বুক যাহাতে খোলা না থাকে বা উঁচু না দেখা যায়, সেজন্যও চাদর দিয়া বুক, গলা, ঘাড় ভালমত ঢাকিয়া লওয়া দরকার। ঠেকা জরুরতবশতঃ মেয়েদের যদি কোন সময় বাড়ীর বাহির হইয়া পথে হাঁটিতে হয় তবে ময়লা-কাপড় পরিয়া, ময়লা চাদর গায় দিয়া, ময়লা-বোরকা মুড়ি দিয়া বাহির হওয়া শ্রেয়ঃ—যাহাতে মেয়েলোকদের রূপ-সৌন্দর্য কোন বেগানা পুরুষের নজরে না পড়ে, ইহাই ইসলামের বিধান।

সিনেমা

সিনেমার মধ্যে পাঁচ রকমের পাপ রহিয়াছেঃ ১। সময় নষ্ট, ২। সম্পদ নষ্ট, ৩। স্বভাব নষ্ট, ৪। স্বাস্থ্য নষ্ট ও ৫। ঈমান নষ্ট।

এই পাপগুলির কারণে আমাদের শুধু স্রোতে ভাসিয়া না যাইয়া হিতাহিত চিন্তা করা দরকার।

যদি নারী-চিত্র বাদ দিয়া শিক্ষামূলক ফিল্ম কেহ তৈয়ার করে, তবে তাহার মধ্যে অতগুলি পাপ থাকিবে না; শুধু জীবের ছবি তোলার পাপ থাকিবে। জীবের ছবিও বাদ দিয়া যদি শিক্ষামূলক ফিল্ম করা যায়, তবে তাহাতে পাপ নাই।

কুসংসর্গ বর্জন

ছেলেমেয়ে হইতেছে পিতামাতার হাতে আমানতস্বরূপ। তাহারা বে-গোনাহ্। পিতামাতারও কর্তব্য হইতেছে তাহাদিগকে কুসংসর্গ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহাদের জন্য সুশিক্ষার এবং সৎ সংসর্গের ব্যবহার করা। যাহারা নামায পড়ে না, পাক-নাপাক, হালাল-হারাম বাছে না, যাহারা ইসলাম বিরোধী এবং ধর্মের বা অন্য মতবাদের প্রচারক প্রচারিকা, তাহাদের সংসর্গে বে-গোনাহ্ সন্তানদিগকে দেওয়া অতি বড় খেয়ানত। এতবড় খেয়ানতের মহাপাপের কথা কল্পনা করাও অসম্ভাব।

নাচ

আজকাল নাচকে একটা চারু শিল্প (fine art) বলিয়া মনে করা হয়। মানুষ যখন একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, নিজের সৃষ্টিকে ভুলিয়া যায়, মৃত্যুকে ভুলিয়া যায়, আখেরাতকে ভুলিয়া যায় এবং আল্লাহ্ ও রাসূলকে ভুলিয়া গিয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, তখনই মানুষ নাচ-শিল্পে মত্ত হয়। মানুষের ধ্বংস তখন অতি নিকটে আসিয়া যায়। যত জাতি দুনিয়ার দর্শন-বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি করা সত্ত্বেও ধ্বংস হইয়াছে, তাহাদের সকলেই নাচ ও রংয়ের মধ্যে, মদ ও স্ত্রীলোকের নেশার মধ্যে পড়িয়াই ধ্বংস হইয়াছে। এই সেই দিনকার কথা—মোঘল সাম্রাজ্যও ধ্বংস হওয়ার বড় কারণ ছিল ইহাই। তাহারা আল্লাহ্-রাসূলকে ভুলিয়া নফ্‌সের খাহেশের পূজার মধ্যে এবং মদ ও নারীর নেশায় পড়িয়াই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। নারীর নেশা মদের নেশার চেয়ে কোন অংশে কম নেশা নয়। এ নেশা মানুষের শিরায় শিরায় এমনভাবে ঢোকে যে, শেষ পর্যন্ত মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে; পাপ-পুণ্যের কোন জ্ঞান থাকে না, মন-মগজ একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে ত একটু দেরীতে হয়, কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহা শীঘ্রই হয়।

অতএব, এই শিল্পকে উন্নত করার অর্থই হইতেছে জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া। কাজেই আল্লাহ্ যাহাদিগকে বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দান করিয়াছেন, তাহারা জাতিকে এই পাপ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করুন। যুবকদের অবস্থা ত এই যে, যাবৎ তাহাদের যৌবনের প্রবাহ আছে, তাবৎ তাহাদের গায়ে একবার এই বিষবাষ্প লাগিয়া গেলে তাহারা চিন্তা করার শক্তিই হারাইয়া ফেলে। যুবতীরাও তথৈবচঃ; কারণ, নারী জাতির মধ্যে ভাবপ্রবণতা এবং আশু আনন্দপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশী; স্থির বুদ্ধিতা এবং পরিণাম চিন্তা খুবই কম। এই ত গেল জাতি ধ্বংসের কথা, জাতির চরিত্র নষ্ট হওয়ার কথা।

ব্যক্তিগতভাবেও যাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঘৃণা-লজ্জা, পুরুষত্ব বোধ বা গায়রাতের নাম-নিশানা আছে, তাহার নিজের স্ত্রী-কন্যাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে বা সামনে নাচিতে অথবা নিজের স্ত্রী-কন্যাকে অন্য পুরুষকে দেখিতে দিতে পারে না। বেগানা আওরতকে চোখ দিয়া দেখা চোখের যেনা, কান দিয়া তাহার কণ্ঠস্বর শোনা কানের যেনা, মন দিয়া তাহার কল্পনা করা মনের যেনা,

হাত দিয়া আগ্রহ সহকারে তাহার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করা ও গায়ে হাত লাগান হাতের যেনা, পা দিয়া বেগানা আওরতকে দেখিবার খাহেশে হাঁটিয়া যাওয়া পায়ের যেনা। এইসব ছোট ছোট যেনার পরেই আসে বড় যেনা করিয়া মহা পাতকী হওয়ার পালা। হে মানুষ! তুমি চিন্তা করিয়া দেখ; তোমার এই অংগগুলি তুমি নিজে সৃষ্টি কর নাই। যিনি তোমাকে এই অংগগুলি দান করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ পাপ কাজে ও এইরূপ অপকর্মে এই অংগগুলিকে ব্যবহার করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার নাফরমানী করার সময় তিনি ইচ্ছা করিলে এই অংগগুলিকে ছিনাইয়া নিয়া তোমাকে বিকলাংগ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি মহা ধৈর্যশীল। দুনিয়ার জীবনে তিনি এইগুলি ছিনাইয়া নিবেন না—যথেষ্ট মোহ্লৎ (সময়) দিবেন। কিন্তু পরকালে তাঁহার ভীষণ আযাবের কথা এবং সীমাহীন গযব ও গোস্বার কথা তোমাদের মনে রাখা উচিত এবং পাপ কাজে আল্লাহ্র এই দানসমূহকে ব্যবহার করা হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত। দুনিয়াতেও পাপের শাস্তি যে একেবারে হয় না তাহা নহে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা সব সময় উহা দেখান না। কখনও কখনও শুধু নজীর দেখাইয়া থাকেন। কারণ, প্রশ্ন আউট হইয়া গেলে ত আর পরীক্ষা হয় না। আর এ দুনিয়া ত শুধু পরীক্ষারই জায়গা। হাদীস শরীফে আছেঃ

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ حَتّٰى يُعْلِنُوْابِهَا اِلَّا فَشَافِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْاَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ مَّضَتْ فِىْ اَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا - (ترغيب ترهيب)

অর্থাৎ, যে জাতির মধ্যে যেনা-ব্যভিচার এবং বেহায়ায়ী (নির্লজ্জতা) খুব বেশী হইবে, এমন কি শেষে আর লজ্জাবোধ বলিতে কিছু থাকিবে না, প্রকাশ্য হইয়া পড়িবে, তখন তাহাদের মধ্যে মড়ক, মহামারী দেখা দিবে এবং এমন এমন বিরাট রোগ দেখা দিবে, যাহা তাহাদের পূর্ব-পরুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল না।

যে ব্যক্তি নাচ বা রং-তামাশার অনুষ্ঠান করিবে বা মাহ্ফিল করিবে, তাহার পাপ হইবে সকলের চেয়ে বেশী।

কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়া গিয়াছেনঃ

مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَّايَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَايَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا - (ترمذى شريف)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্-রাসূলের সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে কোন নূতন পাপের পন্থা সৃষ্টি করিবে—যতলোক তদনুযায়ী আমল করিবে সকলের সমষ্টির সমান পাপের ভাগী সে একা হইবে; অথচ তাহাতে তাহাদের পাপ কম হইবে না।

অনেক সময় এমন হয় যে, পরস্ত্রীর সুর, রং এবং নাচ দেখার কারণে নিজের স্ত্রী হইতে মন ফিরিয়া যায়। এইরূপ হইলে মানুষের সংসারও মাটি হইয়া যায়। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য—আল্লাহ্, রাসূল যে জিনিসকে ঘৃণা করেন সে জিনিসকে তাহারও ঐরূপ ঘৃণা করা উচিত, যেরূপ সে তাহার নিজের মনের ঘৃণিত জিনিসকে ঘৃণা করে।

গান-বাদ্য

মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, কিন্তু সে স্বাধীনতা নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে। মানুষ যত রকমেরই শিল্পের উন্নতি করুক না কেন, তাহার সবেরই মূল সম্পদ আল্লাহ্রই সৃষ্ট এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত। কাজেই আল্লাহ্র দান করা সম্পদের দ্বারা শিল্পের উন্নতির বেলায় আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার ভিতরেই মানুষের থাকা উচিত। মানুষ চায় আনন্দ, নিরানন্দ জীবন তাহার পক্ষে হইয়া পড়ে দুর্বিষহ। কিন্তু সে আনন্দের সীমা নির্ধারিত আছে। সীমাহীনভাবে আনন্দ ভোগ করার জন্য মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। নাচ-শিল্প, বাদ্য শিল্প, সুর-শিল্প—এক কথায় যাবতীয় শিল্পের মূল সম্পদ আল্লাহ্ প্রদত্ত। নাচ-শিল্পের জন্য দরকার হয় একটি দেহের, সেই দেহটি আল্লাহ্ প্রদত্ত; বাদ্য শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয় হাতের, মুখের, যন্ত্রের মস্তিষ্কের এবং শক্তির, ইহার সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত; আর সুর-শিল্পের মূল সম্পদ গলার আওয়াজ, কিন্তু গলার আওয়াজ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্র সৃষ্ট পদার্থের ভিতর আল্লাহ্র দেওয়া মাথা খাটাইয়া, আল্লাহ্র দেওয়া শক্তি খাটাইয়া সৌন্দর্য বাড়ানোর নামই শিল্পের উন্নতি।

আল্লাহ্ তা'আলা আনন্দ উপভোগের জন্য যে সীমা নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাতে নাচ শিল্পের আদৌ অনুমতি নাই। এইরূপে নারীর সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধান অথবা উহার প্রদর্শনী করার আদৌ স্বাধীনতা নাই। নারীর দেহের মালিক স্বয়ং নারী নয়, তাহার দেহের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এই জন্যই সে যদি তাহার নিজের গলা কাটিয়া ফেলিতে চায় বা তার নিজের বুকে সে নিজে পিস্তলের গুলী করিতে চায়, এমন স্বাধীনতা তাহাকে দেওয়া হয় নাই। এইরূপে নারীকে এ স্বাধীনতাও দেওয়া হয় নাই যে, সে তাহার দেহের সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়া উহা পরপুরুষকে দেখাইবে বা সে তাহার দেহের অংগগুলি দ্বারা নাচ করিয়া অন্য পুরুষকে দেখাইবে। —অবশ্য সে তাহার নিজের স্বামীকে দেখাইতে পারে। এইরূপে পুরুষেরও স্বাধীনতা নাই পরস্ত্রীকে দেখার। শুধু নাচের বেলায় এবং সৌন্দর্য প্রদর্শনীর বেলায়ই নয়, নারীর সৌন্দর্য একমাত্র স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের পক্ষে কোন রকমেই দেখার স্বাধীনতা নাই।

সাধারণতঃ গান এবং বাদ্য একই সংগে হয় এবং বাদ্যের সংগে যে গান হয় তাহা সাধারণতঃ স্ফূর্তি এবং আনন্দ উপভোগের জন্যই হইয়া থাকে। এইজন্য গান-বাদ্যকে সাধারণভাবে হারাম করা হইয়াছে। গান অর্থাৎ সুর-শিল্প সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ط أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

ইহার মর্মার্থ এই যে, অনেক লোক এমন আছে, তাহারা গ্রহণ করে, ক্রয় করে কথার খেলা, কথার শিল্প, আল্লাহ্র দ্বীন থেকে লোকদিগকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার জন্য, আল্লাহ্র দ্বীনকে লোকের নিকট ঠাট্টার বস্তু করার জন্য। (অর্থাৎ, তাহারা কথায় কথায় খেলা খেলায়। কথা-শিল্পের এবং সুর-শিল্পের তাহারা উৎকর্ষ সাধন করিয়া আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে মানুষের যে আধ্যাত্মিক

উন্নতির বস্তু আছে, তাহা হইতে মানুষকে গাফেল করিয়া হাসি-ঠাট্টা, মিথ্যা আনন্দ উপভোগ এবং খেল-তামাশায় তাহাদিগকে মগ্ন করিয়া দেয়।) যাহারা এই ধরনের লোক তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে এমন শাস্তি এবং এমন আযাব, যাহার কারণে তাহাদের ভীষণভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

বাদ্য-শিল্প সম্বন্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اِنَّ اللهَ بَعَثَنِىْ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ وَاَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْاَوْثَانِ وَ الصَّلِيْبِ وَاَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ - (مسند احمد)

অর্থাৎ, বিশ্বমানবকে সত্য পথ বাতাইয়া দিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্র অনুগ্রহের পাত্র বানাইবার জন্যই আল্লাহ্ আমাকে এই দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন। সর্বশক্তিমান মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করিয়াছেন হাতের বাদ্য এবং মুখের বাদ্য উভয় প্রকার বাদ্যের অবৈধতা ঘোষণা করার জন্য এবং উভয় প্রকার বাদ্যকে, মূর্তিপূজাকে, ক্রুশকে এবং আল্লাহ্র প্রেরিত ইসলামী আদর্শ বিরোধী অন্যান্য যত প্রকার জাহেলিয়াতের কুসংস্কার আছে সবগুলিকে দুনিয়া হইতে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত করিয়া দেওয়ার জন্য।

অবশ্য লোকদিগকে বিপদ হইতে সতর্ক করিবার জন্য বা কোন খবর ঘোষণা করিবার জন্য বা যোদ্ধাদের মধ্যে বীরত্বের জোশ পয়দা করিবার জন্য যদি বাদ্য হয় তবে তাহা শরীঅতে জায়েয আছে—যেমন গাড়ী ছাড়িবার সময় বাঁশী বাজান হয়, ইফ্তারের, নামাযের, সেহ্রীর বা রোযার খবর ঘোষণা করার জন্য নাকারা বাজান হয় বা যুদ্ধক্ষেত্রে রণবাদ্য বাজান হয়, এগুলি জায়েয আছে। কিন্তু সারাঙ্গী, বেহালা, হারমোনিয়াম, বাঁশী, করতাল, দোতার, সেতার, ঢোল, তবলা ইত্যাদি বাদ্য জায়েয নাই। এই সকল বাদ্য হয় সাধারণতঃ সময় নষ্ট করার জন্য, আনন্দ উপভোগের জন্য এবং মানুষকে পরকালের চিন্তা হইতে বিরত রাখিয়া ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য।

বাদ্যসহ ত কোন গানই জায়েয নাই। বাদ্য ছাড়া গান যদি নারী বা বালক-প্রেমের কথা সংক্রান্ত না হয়, পরনিন্দা বা ব্যক্তিগত কোন সীমাহীন প্রশংসা তাহাতে না হয়; বরং আল্লাহ্র প্রশংসা, রাসূলের প্রশংসা, ইসলাম ধর্মের প্রতি এবং ইসলামী আদর্শের প্রতি যদি তাহাতে প্রেরণা থাকে, দেশপ্রেমের কথা যদি তাহাতে থাকে, তবে তাহা নারীর গলায় না হইয়া যদি পুরুষের কণ্ঠে সুন্দর আওয়াজে গাওয়া হয়, তবে তাহা না-জায়েয হইবে না। এই ধরনের গানকে বাংলার মুসলমান সমাজে গান বা সঙ্গীত বলা হয় না, বলা হয় গযল। নাম যাহাই হউক না কেন, আসল বস্তু চিনিয়া লওয়া দরকার।

আজকাল দুইদল লোক গান-বাদ্যের প্রতি খুব ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একদল হইতেছে এইরূপ যে, ধর্মের প্রতি তাহাদের আদৌ কোন মতিগতি নাই। তাঁহাদের জন্য শুধু আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি— যাহাতে তাহারা সত্য জিনিসটা বুঝিয়া ধর্মের দিকে ফিরিয়া আসে। আর একদল লোক এমন আছে, যাহারা ধর্মের নামে, মারে'ফাৎ বা তাছাওউফের নামে বা চিশ্তিয়া তরীকার নামে গান বাদ্যের দিকে ঝোঁকে। তাহাদের একটু চিন্তা করিয়া ও খোঁজ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি যে, নবীর তরীকার বিরুদ্ধে কোন পীরের তরীকা হইতে পারে কি? আর কোন নামধারী পীর নবীর তরীকার বিরুদ্ধে কোন তালীম করিলে যদি তাহা নবীর তরীকার বিরুদ্ধে যায়, তাহা হইলে সে নাজাত পাইতে পারে কি?—কস্মিনকালেও না। এইভাবে যে নবীর তরীকার বিরুদ্ধে যাইবে, সে